অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **'কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"**, **"বিবাহিতের জীবন সাধনা"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

দ্বিতীয় খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী।

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)

প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচকআশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার দ্বিতীয় খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" প্রকাশিত হইল। নিবেদনমিতি
বিজয়া দশমী, ১৩৬৫

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ইহা প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক
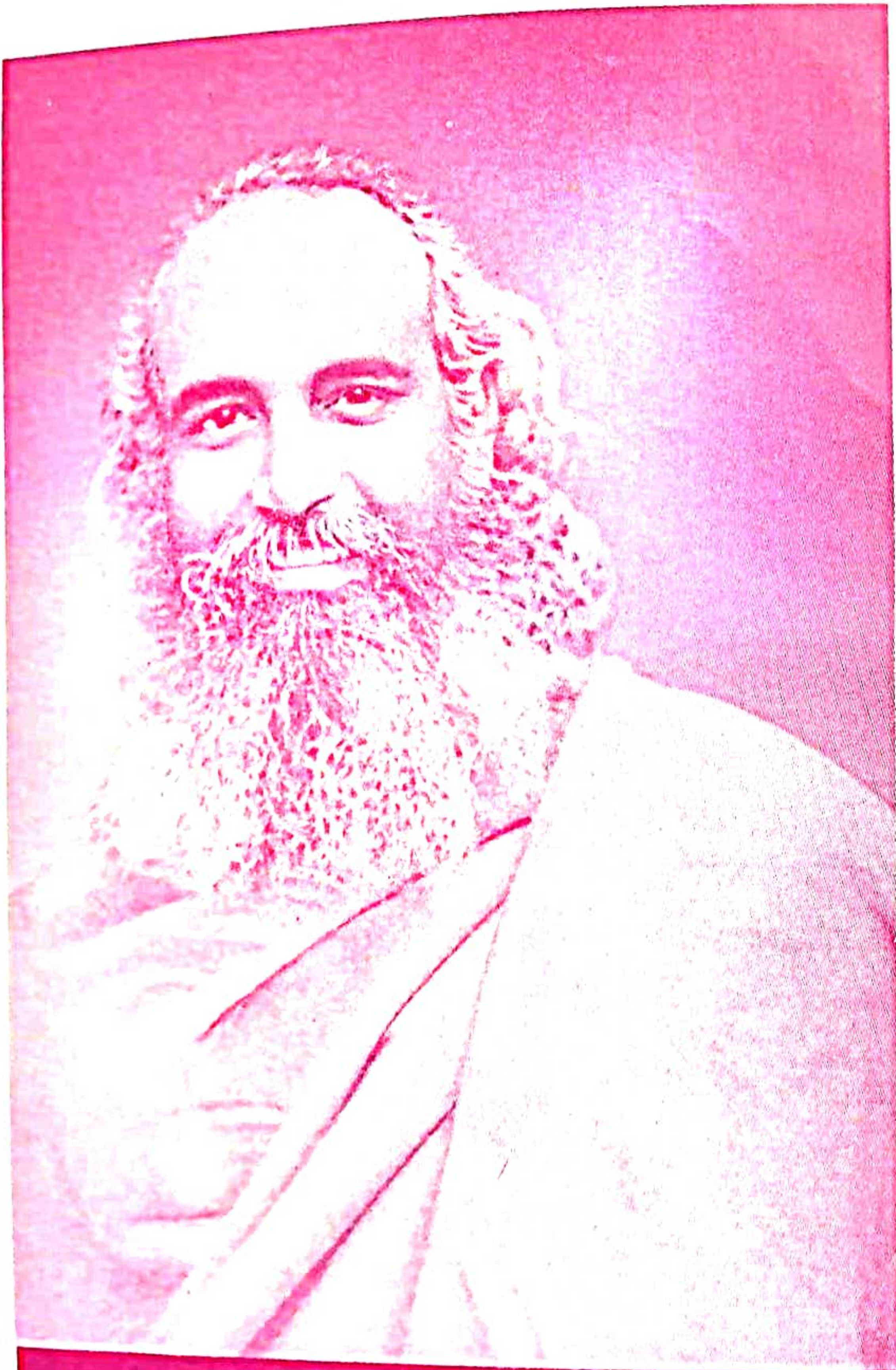
ধৃতং প্রেম্না

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২১শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও।

তোমাদের ওখানে জন পাঁচ ছয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিয়াছিলাম যে, সাম্প্রতিক কতকগুলি ঘটনার চরম পরিণতির কারণানুসন্ধান করিয়া তোমরা কি কি সিদ্ধান্তে পৌছিলে। দুঃখের বিষয়, দুই একজন ছাড়া কেহ এই পত্রের উত্তর দেয় নাই।

অবশ্য উত্তরের জন্য আমি পরম আগ্রহে বসিয়া আছি, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ঘটনাগুলি এবং তাহার কারণগুলি সবই আমি নখ-দর্পণে দেখিতেছি। আমি কেবল চাহিয়াছিলাম যে, পত্রের উত্তর দিতে যাইয়া তোমরা আত্মজিজ্ঞাসায় বসিবে।

উৎসাহ এবং অধ্যবসায় এক জিনিষ নহে। উৎসাহ থাকিলেই কোনও কাজ সুসম্পন্ন হয় না। উৎসাহ সহকারে অধ্যবসায় পরিচালন করিতে হয়। সদিচ্ছা এবং আত্মনিয়োজন এক কথা নহে। সদিচ্ছা

থাকা সত্ত্বেও অনেকে কর্ত্তব্য হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া কাজ পণ্ড হইবার সাহায্য করিয়া থাকে। সংগঠন-কার্য্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আর সংগঠন-কর্য্য পরিচালনা এক কথা নহে। যাহার সংগঠন-সম্পর্কিত ধারণাগুলি সুস্পষ্ট আছে জানিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্যের দায়িত্ব-লাভ হইয়াছিল, এমন লোক কাজে নামিয়া ব্যক্তিগত জিদ ও খেয়ালকে প্রাধান্য দিতে গিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতে পারে।

এইরূপ কত বিষয়ে যে তোমাদের প্রতি জনের আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল, তাহা বলিবার নহে।

আত্মজিজ্ঞাসার যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা কোনও কর্ম্মচেষ্টার সাফল্য-বৈফল্য হইতেই কোনও স্থায়ী বা মূল্যবান্ শিক্ষা আহরণ করিতে পারে না।

এই জন্যই আমি চাহিয়াছিলাম যে, তোমরা প্রতি জনে আলাদা আলাদা করিয়া আমার প্রশ্নের জবাব দিতে বসিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত দোষগুণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার কর।

যে কাজ তোমাদের হাত ছিটকাইয়া চলিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই কাজটী আবার তোমাদের হাতে আসিবে না। মাছ বড়শীতে টোপ গিলিবার পরে যদি একবার ছুটিতে পারে, তবে সেই চারে আর ধরে না। তোমাদের হাতে নূতনতর কাজ আসিতেছে। একটী কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিলে পরবর্ত্তী কাজ ভিন্নতর প্রণালীর হইলেও তাহাতে কতকটা স্বভাব-পটুত্ব প্রকাশ করা যায়। পূর্ব্ব কর্ম্মে লব্ধ আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ পরবর্ত্তী কর্ম্মের বড়ই উপচায়ক হয়।

অতীত কর্ম্মের সাফল্য পরবর্ত্তী কর্ম্মোদ্যমে এক স্বাভাবিক

আগ্রহের সৃষ্টি করে। তোমাদের কি পরবর্ত্তী কর্ম্মোদ্যমের জন্য আগ্রহ আসিয়াছে? কি সেই কর্ম্ম, সেই বিষয়ে কি তোমরা চিন্তা আরম্ভ করিয়াছ?

তোমাদের জেলাটার প্রায় চারি ধার দিয়া দলে দলে আদিম অধিবাসীরা বাস করিতেছে। লালং, গারো, খাসিয়া, মিকির, কাছাড়ী এবং অন্যান্য খণ্ডজাতির লোকেরা টিলায় টিলায় গিজ গিজ করিতেছে। না জানে ইহারা জীবন-যাপনের প্রণালী, না জানে ইহারা মনুষ্য-জীবনের তাৎপর্য্য। কোনও প্রকারে খাওয়া, শোওয়া, সন্তান উৎপাদন করা, কেহ মরিলে তার জন্য কাঁদা এবং দুদণ্ড পরেই আবার শিকারে বাহির হওয়া, এই সকল জীব-সুলভ সাধারণ কাজের বাহিরে ইহাদের অধিকাংশেরই চিন্তা অগ্রসর হয় না। কেন জন্মিয়াছে, বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়, মরিবার মত মরিতে হয় কেমন করিয়া, এই সকল চিন্তা ইহাদের অনেকের মনে এখনও জাগে নাই। একটী খণ্ড উপজাতি অপর একটী উপজাতির সহিত নিয়ত সংঘর্ষ করিয়া চলিতেছে, জাতিতে জাতিতে মিলনের সেতু যে জ্ঞান, তাহা ইহাদিগকে কেহ দেয় নাই।

এই সময়ে তোমরা কি অগ্রসর হইয়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন অনুভব কর না?

তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র সহরটীই যে পৃথিবীর সমগ্র আয়তন নহে, ইহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। তোমাদের ক্ষুদ্র সংসারটীই যে তোমাদের কর্ত্তব্যের শেষ পরিধি নহে, তাহা তোমাদের জানিবার সময় আসিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কাহারও একক শক্তিই যে জগতের

প্রতিটী কর্ত্তব্য-পালনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, কৌশলের মধ্য দিয়া সকলের শক্তিকে একটী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিবার যে প্রয়োজন সত্যই অপরিহার্য্য, এই কথা স্বীকার করিবার দিন আসিয়াছে।

তোমার সহকর্ম্মী, সমমর্ম্মী, সমধর্ম্মী প্রতি জনকে ডাকিয়া আনিয়া এই কথাগুলি শুনাও। আর ত' একা বসিয়া থাকিতে পারিবে না।

তোমার জেলার প্রান্তে প্রান্তে যেখানে যে কর্ম্মীসঙ্ঘ বা মণ্ডলীটীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানেই এই সংবাদ প্রেরণ কর যে, যেখানেই যাঁহারা যেই শুভপ্রয়াস সুরু করিবেন, সেখানেই তোমরা জেলার সদর বা প্রধান সহরগুলি হইতে দলে দলে প্রতিনিধি যাইয়া সেই প্রয়াসে বল-সংযোজন করিবে।

সম্প্রতি হাজারিবাগ জেলার ক্ষুদ্র একটী পল্লীতে একটী মাত্র যুবক-কর্ম্মীর আমন্ত্রণে টাটানগর হইতে জনা চল্লিশ প্রেমবান ভক্ত যুবক গিয়াছিল হরিনামের বন্যা লইয়া। দুটি দিনের ব্যাপার। কিন্তু এ বন্যায় অনেক অনুর্ব্বর হৃদি-প্রান্তরে গঙ্গার পলি জমিয়াছে, অনেক নীরস প্রাণ সরস সারালু হইয়াছে। এই একটী মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

তোমাদের জেলায় টাটানগরের মত বিরাট সহর নাই কিন্তু যে দুইটী ক্ষুদ্র সহর আছে, তাহাতে মাথা-গুণতিতে তোমাদের সংখ্যা কম নহে। টাটানগরের কর্ম্মিসংখ্যার তুলনায় তোমাদের সংখ্যা অনেক অধিক হইবে। তাহা ছাড়া তোমাদের জেলায় এমন চারি পাঁচটী গঞ্জ রহিয়াছে, যে সকল স্থানে তোমাদের সংখ্যা নগন্য নহে। তোমরা যদি মিলিত হইয়া বিশেষ তারিখে মিকির, লালং, রাপিনী এবং নাগাদের পল্লীতে গিয়া কাজ করিয়া আসিতে থাক, তাহা হইলে তাহার যে

বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা ভাবিতেও বিস্ময় লাগে। এই উদ্দেশ্যে এখনই কি তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি-সভার আর একটা বিশেষ অধিবেশন ডাকিতে পার না?

সমতলে তোমরা তোমাদের ধর্ম্মপ্রচার সুরু করিলে হিন্দুধর্ম্ম-ভুক্তই অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি তাড়িয়া মারিয়া পাগল-পারা হইয়া ছুটিয়া আসিবেন তোমাদের আদর্শ-প্রচারের চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করিতে। এই সত্য বিগত পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া কতকগুলি স্থানে এমন নির্ল্লজ্জ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যে, ভাবিতে অবাক্ লাগে, মহাপুরুষদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া আধুনিক শিক্ষিত মানুষ কেমন করিয়া এমন হইতে পারেন। কিন্তু ইহা লজ্জাজনক হইলেও বেদনাদায়ক সত্য। যেখানে যেখানে তোমরা প্রবল বিরোধ পাইয়াছ, তাহার সকল স্থানেই তোমরা পরাজিত না হইলেও তোমাদের কর্ম্মোদ্যম যে কমিয়া গিয়াছে, ইহা আমি সকৌতুকে লক্ষ্য করিতেছি। তোমাদের মধ্যে সঞ্জাত এই অন্যায় হীনমন্যতার প্রতীকার করিবার জন্যও ত' বাছারা ক্ষেত্রান্তরে কিছুকাল মনোনিবেশ করা দরকার। সমগ্র জেলার সবগুলি কর্ম্ম-সংস্থার যাবতীয় শক্তি একত্র করিয়া এক এক মাসে এক একটা পার্ব্বত্য কেন্দ্রে কাজ করিবার জন্য সদলবলে যাইবার কর্ম্মতালিকা করা কি তোমাদের পক্ষে একান্তই অসাধ্য? অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী জন-সংখ্যায় অল্পবল হইলেও কাজ করিবার আগ্রহ রাখে। সহর এবং গঞ্জগুলি হইতে তোমরা প্রত্যক্ষ সহযোগ দিয়া কেন তাহাদের উৎসাহে ইন্ধন যোগাইবে না? সহর-বন্দরে বাস কর বলিয়া এই সকল প্রত্যন্ত-স্থানের মণ্ডলী-গুলি তোমাদিগকে সভ্য, উচ্চ ও অভিজাত

বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। তোমরা সত্যই যে সভ্য, সত্যই যে উচ্চ, সত্যই যে অভিজাত, তাহা কি তোমাদের সর্ব্বজনালিঙ্গনকারী প্রেমময় কর্ম্মের দ্বারা প্রমাণিত করিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২১শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে এবার তোমরা অনেক দর্শনার্থী আগরতলা অসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলে কিন্তু ভিসা-পাসপোর্টের অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ কাহারও আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নাই জানিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। দুইটী দেশ, যাহারা একই দেশের অঙ্গীভূত ছিল, হাজার বছর ধরিয়া যাহাদের অধিবাসীরা পরস্পর পরস্পরের সহিত অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য ছিল, যাহাদের ভাষা এক, চিন্তাধারা প্রায় সমতুল, সুখ-দুঃখ এক এবং জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষা মিলের দিকটাই বেশী, তাহাদের মধ্যে হঠাৎ এক রাষ্ট্রীয় প্রাচীর সৃষ্টি হওয়াতে কোমলস্বভাব চিত্তগুলির যে পরিমাণ কষ্টের সৃষ্টি ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা দেখি না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমারেখার অদল-বদল বারংবারই হইয়াছে এবং হইবে। তৎসত্ত্বেও মানুষের সহিত মানুষের আপনত্বের

সম্পর্ক ত' ছিন্ন হইতে পারে না। কে কোন্ রাষ্ট্রের অধিবাসী, ইহা একটা ভৌগোলিক এবং সাময়িক সত্য মাত্র, কিন্তু আমরা সকলেই যে একই মানবজাতির অংশীভূত, ইহা সর্ব্বজনীন সত্য। এই সত্যে সুস্থির হইয়া মনের দুঃখ হ্রাস কর।

তোমরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে দেশত্যাগ করিয়া ভারত-রাষ্ট্রে চলিয়া আস, ইহা ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা যে চাহেন না, তাহা এতদিনে সুস্পষ্ট হইয়াছে। সরকারী বিবৃতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন সময়ে পরস্পর-বিরোধী যে সকল ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম যাহাই হউক, ভারতের জনমত সমস্বরে এই কথাই বলিবে যে, তাহাদের দেশের সরকার পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের ভারতে আগমন পছন্দ করেন না। এই স্থানে জনমতের সহিত সরকারী মতের এক গুরুতর সংঘর্ষ হইতেছে। সরকার যে কারণেই তোমাদের ভারতাগমন অপছন্দ করুন না, জনসাধারণএকবাক্যে ইহা স্বীকার করে যে, এদেশে তোমাদের সম্মানজনক পুনর্ব্বা-সনের সুব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব ভারতীয় রাষ্ট্র-কর্ণধারদের। জনমত একবাক্যে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, দেশ-বিভাগের মতন ক্ষতিকর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নেতারা যে দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়াছিলেন, এখন তাহা পালনে তাঁহারা অনিচ্ছুক।

এই সকল ব্যাপারের ভালমন্দের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমি আর একটী দিক হইতে বলিতে পারি যে, তোমরাও কেহ পারতপক্ষে তোমাদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিতে ইচ্ছুক নহ। পূর্ব্বপুরুষের ভিটার প্রতি সহজ মানুষের যে স্বাভাবিক প্রীতি থাকে, তাহা তোমাদের জীবনে এত অকপট যে, তোমরা নিজেদিগকে

নানাভাবে উপদ্রুত জানিয়াও মাটি কামড়াইয়া সেখানেই পড়িয়া আছ। জন্মভূমির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ এত সুন্দর যে, শুধু এই জন্যই তোমাদিগকে অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

আমি তোমাদিগকে এই সময়ে যে উপদেশ দিতে পারি, তাহা এই যে, জীবনের প্রতিটি প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় অভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিবার জন্য প্রয়াসী হও। কার জন্য কোন্ দেশে বসতি তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁর মঙ্গলময়ী ইচ্ছার ভিতরে যে তোমার প্রতি আক্রোশমূলক অভিসন্ধি কিছুই নাই, বরং সবই যে তিনি তোমার মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন, এই বিশ্বাসটীর উপরে দৃঢ়ভাবে ভিত্তিমান্ কর তোমার সমগ্র অস্তিত্বকে। যে দেশেই থাক আর যে দেশেই যাও, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই রাজত্ব। তাঁর রাজত্বের বাহিরে কোথাও যাওয়া যাইবে না। তিনি সর্ব্বদেশের সকল সরকারের উপরে সর্ব্বময় প্রভু। তিনি তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি দিয়া তোমাকে নিয়ত লক্ষ্য করিতে থাকিবেন। একটী মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার করুণা হইতে তুমি বঞ্চিত হইতে পার না! সুতরাং "কোথায় যাইব" বা "কোথায় থাকিব" ইহা তোমাদের জীবনে কোনও প্রশ্নও নহে, সমস্যাও নহে। যে কোনও অবস্থাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ কর।

আসল কথা ঈশ্বর-প্রেম। ভগবানকে সর্ব্বশক্তি দিয়া ভালবাস। মনের সকল আবিলতা দূর করিয়া দিয়া নির্ম্মল ঈশ্বর-প্রেমে ডোব। প্রেমের প্রবাহ তোমাকে কর্ত্তব্যের ডাকে যেখানে ডাকিয়া নেয়, সেখানেই নির্ভয়ে যাও। বাধা দেখিয়া ভয় পাইও না, বিঘ্ন দেখিয়া হতাশ হইও

না। ভগবানকে যে জীবনের সকল দায় সঁপিয়া দিয়াছে, তাহার কাছে দুঃখ, লাঞ্ছনা ও মৃত্যু সবই স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বর্গসুখ লাভের তুল্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২১শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের —, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কল্যাণীয়া সাধনা যখন করিমগঞ্জ গিয়াছিল, তখন তোমার সহধর্ম্মিণী নিয়ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতন অবস্থান করিয়াছিলেন শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। ইহা দ্বারা তাঁহার অন্তরের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু সাধনা তোমার বাড়ীতে স্বল্পকালের জন্যও পদার্পণ করিতে পারে নাই বলিয়া তোমার স্ত্রী মনের দুঃখে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, এই সংবাদটা শুনিয়া বাবা ভাল লাগিল না। যাহারা সমাজ-কল্যাণ-কাজে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে, তাহাদিগকে রেল-ষ্টীমার-বিমানের সময় দেখিয়া চলিতে হয়। তাহাদিগকে পরবর্ত্তী স্থানগুলির জন্য রচিত কর্ম্মসূচীর দিকে তাকাইতে হয়। আর জন-সাধারণের তাকানো উচিত তাহাদের স্বাস্থ্যটীর প্রতি, যাহা অক্ষুণ্ণ না থাকিলে যে-কোনও সময়ে

বহু স্থানের কর্ম্মসূচী একসঙ্গে বাতিল হইয়া গিয়া বহুজনের আশাভঙ্গ, বহু কর্ম্মীর আয়োজনে বিফলতা এবং বহু কর্ম্মের সুষ্ঠু উদ্‌যাপনে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটাইতে পারে। অবশ্য, বিগত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অসংখ্য ভ্রমণ-সূচীতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমা্দের স্বাস্থ্যের ভালমন্দ নিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন-বোধ জন-সাধারণের নাই। আড়াই তিন বৎসর কাল বুকে প্লুরিসির প্রলেপ বাঁধিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। মানুষের কাছে হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তবু অনাবশ্যক ও অসাধ্য নূতন নূতন কর্ম্মসূচীর হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায় নাই। সাধনাকেও তোমরা সকলে মিলিয়া ঠিক সেই অবস্থাটীতে ফেলিয়াছিলে। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কাজ করিবার জন্য সাধনা স্থানের পর স্থান ভ্রমণ করিতেছিল। পরবর্ত্তী এক স্থানের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্যই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিস্থানে একটু আধটু সময় বিশ্রাম করিয়া নেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহা সে কোথাও নিতে পারে নাই। নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচীর বাহিরেও ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত তাহাকে এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ীতে কেবল দৌড়িতে হইয়াছে। যত জনে যত অনুরোধ করিয়াছ, সব সে হাসিমুখে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ট্রেণ বা বিমান ধরিবার মুখে যখন অনুরোধ আসিয়াছে, ঠিক সেই সময়টীতে কে কাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে? অনুরোধকারীরা নিজ নিজ স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিয়া এইরূপ অনুরোধ হইতে ক্ষান্ত না হইয়া এই সকল জরুরী অবস্থায়ও অনুরোধ কেন রক্ষিত হইল না, তাহা নিয়া স্বাভাবিক অক্ষমতাকেও দোষের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু উপায় ত' নাই!

সমাজের সেবার জন্য যাহারা দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভ্রমণ-কার্য্যটী কোনও সুখকর ব্যাপার নহে। এই অবস্থায় তাহাদের কার্য্যক্রমানুযায়ী চলিতে সাহায্য করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। একটা মানুষ যতটুকু কাজ করিতে পারে, তার চেয়ে অনেক গুণ অধিক কাজের দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়া ইহারা পর্য্যটনে বাহির হয়। ইহারা যেই আসল কাজগুলি করিতে বাহির হইয়াছে, তাহা যাহাতে ষোল আনা সুচারুতার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে এবং সেই কার্য্যের অভিলষিত সুফল পূর্ণরূপে আদায় হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চারিদিক হইতে প্রতিজনের সহযোগ করা উচিত। তাহা না করিয়া তোমরা জনে জনে "আমার বাড়ী চলুন", "অমুকের বাড়ী একবার না গেলে তাদের মনে বড় দুঃখ হইবে" ইত্যাদি করিয়া যদি টানাটানি সুরু করিয়া দাও, তবে ত কর্ম্মী বেচারীর নাজেহাল হইয়া যাইবার কথা। তোমরা এই সকল কর্ম্মীদের প্রতি একটু সদয় হইতে শিখ আর অন্তরে অন্তরে বিচার কর যে, তোমাদের প্রেম কোথা হইতে জন্মিয়াছে? প্রেমের প্রকৃত জন্মভূমিকে চিনিলে মিথ্যা উচ্ছ্বাসগুলিকে দমন করা তোমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

একজন সাধু ব্যক্তি তোমার গৃহে গেলে তোমার কল্যাণ হইবে। এই বুদ্ধিতে তাঁহাকে নিয়া তোমরা যে টানাটানি করিয়া থাক, ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। এই বুদ্ধিটার মধ্যে কোনও নিন্দনীয় ব্যাপার নাই। কিন্তু সাধু ব্যক্তি তোমার গৃহে গেলে যেমন তোমার কল্যাণ, তোমার পাড়া-প্রতিবেশী আরও পঞ্চাশ জন লোকের গৃহে গেলে তাঁদেরও

ত' কল্যাণ। তবে কেন একাকী কল্যাণটুকু চাহিতেছ? তাঁহাদের প্রতিজনের ঘরে এই সাধু ব্যক্তিকে কেন নিয়া যাইবে না? একাকী কেন কল্যাণ ভোগ করিবে? কেন সকলকে কল্যাণভাগী করিবে না? এই বিষয়টী কেন ভাব না?

প্রকৃতই যদি কেহ সাধু ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার কাছ হইতে কল্যাণ আহরণ করিতে হইলে তাঁহার আশীর্ব্বাদ-কামনাই যথেষ্ট। তাঁহাকে জোর-জবরদস্তি করিয়া ঘরে ঘরে টানিয়া নিয়া যাইবার কোনও অবশ্যকতা নাই। সাধু ব্যক্তিদের প্রসন্ন মন এক অপরিমিত শক্তির আধার। সেই মনটী হইতে যদি সদিচ্ছার তরঙ্গ বাহির হয়, তবে তাহা জগতের কল্পনাতীত কুশল সম্পাদন করিতে পারে। এই আসল জায়গায় লক্ষ্য না রাখিয়া তোমরা যে নকল ব্যাপারে এত শক্তি, সামর্থ্য এবং উচ্ছ্বাসের অপচয় করিয়া থাক, তাহার বড়ই বিসদৃশ।

এই কথাগুলি তোমার স্ত্রীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। তিনি যে সেই দিন হইতে ঘন ঘন মুর্চ্ছায় আক্রান্ত হইতেছেন, ইহার সহিত তোমার গৃহে সাধনার যাওয়া না-যাওয়ার কোনও সম্পর্কই নাই। সাধনা যদি ঐ সময়ে করিমগঞ্জ অঞ্চলে আদৌ না যাইত, তথাপি তোমার সহধর্ম্মিণীকে মূর্চ্ছা, আমাশয় ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইতেই হইত। মনের আবেগ বশতঃ মূচ্ছা, আমাশয় ও হৃদ্রোগ কাহারও কাহারও হইতে দেখা যায় না, তাহা নহে কিন্তু মনের দুঃখে কাহারও আমাশয় রোগ হয় না। আর, পুরাতন আমাশয় হইতে শতকরা সত্তর জন লোকের হৃদ্রোগ হইয়া থাকে, ইহাও প্রসিদ্ধ। তোমার স্ত্রীর

রোগ সম্পূর্ণই পূর্ব্ব-কারণজনিত। শরীরের মধ্যে রোগোৎপাদনের হেতুগুলি আগেই জমিয়া ছিল। দৈবাৎ গাছ হইতে কাক উড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পাকা তালটী টিপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। দোষ রটিল যে, কাকে তাল ফেলিয়া দিয়াছে।

দীক্ষা দিতে গিয়া এইরূপ অপবাদের মুখে আমাকেও কখনও কখনও পড়িতে হইয়াছে। এক ব্যক্তি কাবুলিওয়ালার কাছে মাসিক শতকরা বারো টাকা সূদে হাজার টাকা ধার নিয়াছিল। চাকুরী করিত সে দুই শত টাকা মাহিনার। কাবুলিওয়ালার সূদই তাহা হইতে প্রতি মাসে এক শত বিশ টাকা দিতে হইত। বাকী আশি টাকায় সংসার চলিত না। সর্ব্বস্বান্ত হইবার মুখে সে অন্যান্য বহুজনের সহিত একদিন এক দীক্ষা-গৃহে বসিয়া যায় এবং আমার কাছ হইতে যথারীতি দীক্ষাও পায়। তাহার এক সপ্তাহ মধ্যে কাবুলিওয়ালা অশেষ লাঞ্ছনা দিয়া তাহার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া বিক্রী করিয়া দিয়া প্রাপ্য অর্থ আদায় করে। গরীব বেচারী পথের ভিখারীতে পরিণত হয়। তাহার এই দুর্ভোগের কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অভাব হইল না। একজন ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন,—"হাতে হাতে ফল পাইলে ত! এই দেখ, কায়স্থের ছেলে হইয়া ওঙ্কার-ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার কি পরিণাম!" আমাকে তখন পত্র লিখিয়া শিষ্য-প্রবরকে বলিতে হইল,—"যদি প্রণব-বর্জ্জিত অন্য কোনও মন্ত্র জপ করিলে সাত দিনের জায়গায় সাত সপ্তাহ মধ্যেও কাবুলীওয়ালার ঋণশোধ হইবার পথ খুলিয়া যাইবে বলিয়া কেহ গ্যারাণ্টি দিতে

পারেন, তবে এই মুহূর্ত্তে আমার প্রদত্ত মন্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই মন্ত্রে দীক্ষা নাও।" কিন্তু ব্যাখ্যা-কর্ত্তারা সেই গ্যারাণ্টি দিতে পারেন নাই। তাঁহারা আমতা আমতা করিয়া বলিয়াছেন,—"তোমার পূর্ব্বকর্ম্মফল তোমাকে ভিখারী করিয়াছে, আমরা তাহার কি করিতে পারি?" সাফ্ জবাব!

তোমার স্ত্রীরও রোগাক্রমণের কারণগুলি পূর্ব্ব হইতে শরীরের মধ্যে জন্মিয়াছিল। রোগ যাপ্য অবস্থায় লুকাইয়াছিল। হঠাৎ অনিয়ম পাইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। এখন তাঁহার চিকিৎসা প্রয়োজন। আংশিক মানসিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু মুখ্যতঃ প্রয়োজন শারীর চিকিৎসার। বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এবং রোগিণীকে নিয়ম-পালনের প্রতি নিষ্ঠাবতী রাখিয়া এই আগন্তুক বিভ্রাট হইতে মুক্তিলাভ কর।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারের চিকিৎসা আধ্যাত্মিক, মানসিক ব্যাপারের চিকিৎসা মানসিক, শারীরিক ব্যাপারের চিকিৎসা শারীরিকই করিতে হয় জানিবে। পরমপ্রভুকে জীবনের অধীশ্বর বলিয়া জানিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময় হয়। সর্ব্বজীবে প্রেমের অনুশীলনের মধ্য দিয়া মানসিক ব্যাধি সারে। শরীরকে শৌচ, সদাচার, সংযম ও সুনিয়মের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া উপযুক্ত ঔষধাদি সেবন করিলে শরীরের ব্যাধি সারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২১শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার শারীরিক অসুখের সংবাদ শুনিয়া চিন্তিত হইয়াছিলাম কিন্তু এখন বুঝিতেছি, চিন্তার কোনও কারণ নাই। তুমি অতি সামান্য ঔষধ-প্রয়োগে এবং মনের বলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করিবে। ঔষধ-প্রয়োগও কখনো কখনো মনের বল বাড়াইবার জন্যই প্রয়োজন হয়। ব্যবস্থাপিত ঔষধকে তুমি অবহেলা করিও না।

মনের বল বাড়ে দুইটী উপায়ে। একটী উপায় পুরুষকার-সাধ্য। নিয়ত কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক,—"আমি সুস্থ হইব।" দ্বিতীয়টী নির্ভর-মূলক। ভগবান সত্য, জীবের প্রতি তাঁহার করুণা সত্য, সকল দুঃখ-সন্তাপে তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি তিনি নিয়ত মঙ্গলময় বিধানই করিয়া থাকেন, আপাততঃ ক্লেশপ্রদ হইলেও তিনি যখন যাহা করিতেছেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন,—এই বিশ্বাসে হৃদয় ভরপূর করিয়া রাখা।

সাধারণ লোকে বলিতে পারে যে, উপরে বর্ণিত দুইটী উপায় পরস্পর-বিরোধী কিন্তু অনুশীলন আরম্ভ করিলে দেখিতে পাইবে যে, দুইটীর মধ্যে একটী চমৎকার সামঞ্জস্য-সূত্র রহিয়াছে, যাহা যুক্তির চোখে ধরা পড়ে না। ঈশ্বর-নির্ভরের সহিত পুরুষকারের বিরোধ নাই।

তুমি এই জিদ নিয়া চল যে, তোমাকে সুস্থ হইতেই হইবে। তোমার সুস্থতা তোমার আত্মকল্যাণের জন্য প্রয়োজন, তোমার অগণিত আত্মীয় জীবকূলের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। তুমি মনকে ক্ষণকালের জন্যও দুর্ব্বল হইতে দিও না বাবা।

কল্যাণীয়া সাধনা যখন পাহাড় লাইন দিয়া আসিতেছিল, তখন তুমি তাহার হাতে গুরুসেবার জন্য একশত ত্রিশ টাকা দিয়াছিলে। গোপনে দিয়াছিলে বলিয়াই আমি সেই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। কিন্তু তোমার টাকা কয়টীর প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছি। আমার অন্ন বা আমার বস্ত্র আমাকে কতটুকু সেবা দিতে পারে? তাই তোমার এই পবিত্র অর্থ আমি নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করি নাই। তোমার গুরু জগতের কোটি কোটি অন্নহীনের ক্ষুধার্ত্ত জঠরে, গৃহহীনের নিরাশ্রয় গৃহতলে বাস করিতেছেন। সেখানে আমি টাকাগুলি বিলাইয়া দিয়াছি। প্রত্যেকটী কপর্দ্দক পরমপ্রেমভরে বিলাইয়াছি। কারণ, আসিয়াছে ইহা এক নীরব প্রেমিকের সাত্ত্বিক দানেচ্ছা হইতে। প্রেমের দান জগতে দুর্ল্লভ।

দানের প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। কেবল গ্রহণেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয় না, দিয়া সে হয় সত্য সত্য সুখী। গ্রহণে সুখ আছে কিন্তু তৃপ্তি নাই। দানে সুখ আছে, তৃপ্তিও আছে। আর তৃপ্তি আছে বলিয়াই দানের সুখ যথার্থ সুখ।

কিন্তু মানুষ দান করিতে চাহে কাহাকে? যাহাকে আপন বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে। ভাল না বাসিলে কাহাকেও আপন বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে দান সফল হয় ভালবাসায়। তোমার ভালবাসা

একমাত্র আমাতেই আবদ্ধ না থাকিয়া নিখিল বিশ্বে হউক পরিব্যাপিত। আমাকে কেবল সাড়ে তিন হাত দেহটীর মধ্যে না দেখিয়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুতে দর্শন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২১শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি একাকী একটা দূর বিদেশে একেবারে অপরিচিত জন-সাধারণের মধ্যে নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার সকল তাড়না সহ্য করিয়াও ক্রমশঃ যে ভগবানের নামের বৈজয়ন্তী উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর প্রদেশে উড্ডীন করিয়া যাইতেছ, সেই সংবাদে পুলকিত হইলাম। তোমার কার্য্য দ্বারা আর এক বার প্রমাণিত হইল যে, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, সৎ চেষ্টার পশ্চাতে ধীরে ধীরে জনসাধারণের সহযোগ আসিয়া যায়, পরমেশ্বরের নাম করিয়া যে নির্ভয়ে পথে নামে, তার উদ্যমের নিঃস্বার্থপরতাই তাহার পথের কণ্টক সরাইয়া নেয়।

বিশ্বাস রাখিও তোমার চেষ্টার পরিপূর্ণ সাফল্যে আর বিশ্বাস রাখিও মানুষ মাত্রেরই দেবত্বে। ঐ যে তোমার চারিদিকে প্রেতবৎ কদাকার নর-কঙ্কাল সমূহ যেন যন্ত্রচালিত হইয়াই উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে

বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা সত্য সত্যই প্রেত নহে, তাহাদের মধ্যেও দেবত্ব আছে। সেই দেবতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের সেবায় হও অগ্রসর।

অনেক দূরে দূরে তোমার সমভাবের ভাবুকেরা রহিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত নিয়ত যোগাযোগ রাখিও। তাঁহাদের মধ্যে যত জনকে সম্ভব তোমার কর্ম্মকেন্দ্রে আনাইয়া জনসাধারণের জ্ঞানোন্মেষণ ও প্রেমোল্লসন কার্য্যে যত্নবান হইতে বাধ্য করিও। যাঁহারা তোমার কেন্দ্রে আসিয়া মাঝে মাঝে কাজ করিয়া যাইতেছেন, তুমিও সম্ভবমত তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্রে দুই এক বার ঘুরিয়া আসিও। তোমাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সমগ্র ত্রিভুবন। খণ্ড খণ্ড ভাবে এক এক জনে এক এক কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকিলেও প্রত্যেক বহিঃকেন্দ্রের সহিত তোমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অত্যাবশ্যক।

সাফল্যে অতিমাত্রায় আহলাদিত হইয়া কাজে কখনও ঢিলা দিও না। প্রতি জীবের কাণে কাণে শোনাও, অবতারকল্প মহাপুরুষেরা যাহা, তাহারাও তাহা। একই পরমেশ্বর হইতে সকলের অবতরণ। এক দল সাধনা করিয়া ভিতরের সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগাইয়াছেন, অপর দল সাধনা করিল না বলিয়া জগতে পশুবৎ বিচরণ করিতেছে। সাধনা করিলে এখনও ইহারা অবতারকল্প পুরুষদের ন্যায় বড় হইতে পারে।

এই সকল অজ্ঞ মুর্খ নিরক্ষর নরনারীদের শুনাও যে, ইহাদের উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে যাঁহারা অসিয়াছেন, সকলে ইহাদেরই মতন

নানা সমস্যা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়া জীবনের পথ চলিয়াছেন এবং তপস্যার বলে সকল বাধা-বিঘ্ন জয় করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন।

ইহাদের প্রতি জনের হৃদয়ের পরতে পরতে এই বোধটী গাঁথিয়া দাও যে, যে ব্যক্তি পরের জন্য যত অধিক অনুভব করে, সে হয় তত সুন্দর এবং তত মধুর। পরের ব্যথা যাহার জীবনে করুণ সঙ্গীতের করে সৃষ্টি আর অশ্রুধারা রূপে হয় প্রবাহিত, তাঁহারই নাম মহাপুরুষ। এই সকল সাধারণ লোকেরা প্রতি জনেই মহাপুরুষ হইতে পারে। মহাপুরুষ নামে এক উচ্চ শ্রেণীর দেবতারা চিরকালই আসিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের পূজার দাবী করিবেন, ইহা হইতে পারে না। সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাই পরের দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজেদের স্বার্থ ভোলেন এবং ক্রমশঃ মহাপুরুষ হন। মহাপুরুষ হইবার পরে সেই সাধারণ লোকটীকেই জগদ্বাসী ভক্তিভরে পূজা করিয়া লাভবান্ হয়।

প্রথম জীবনে মাতাল, পববর্ত্তী জীবনে মহাপুরুষ, প্রথম জীবনে লম্পট, পরবর্ত্তী জীবনে লোকপাবন পুরুষোত্তম, প্রথম জীবনে নরহন্তা, পরবর্ত্তী জীবনে জগদুদ্ধারকারী পরিত্রাতা,—এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দুর্ল্লভ নহে। অতএব, যাহারা পাপের পল্বলে ক্লেদাক্ত পশুর মত হিতাহিত-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া বেড়াইতেছে এবং পঙ্কিল আবর্জ্জনা ও কর্দ্দম ছড়াইয়া চতুর্দ্দিকের শান্তি, স্বস্তি ও স্বাস্থ্য নাশ করিতেছে, এমন নারকীদিগকেও গিয়া এই আশার বাণী শুনাইবার প্রয়োজন আছে যে, ফিরিলে তাহারাও জীবনে কাজের মত কাজ

কিছু করিয়া যাইতে পারে। মহাপুরুষ হইবার অধিকার তাহাদেরও আছে।

ছড়াও কেবল আশার বাণী, বিলাও কেবল আশ্বাস।

প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২২শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কয়েকটা ধর্ম্মসঙ্ঘের নাম লিখিয়াছ, যাঁহারা নানাভাবে জনহিতকর কার্য্য করেন। তাঁহারা কোনও কোনও কাজ অত্যন্ত বিরাট ভাবেই করিতেছেন। তাঁহাদের কাজের স্বাভাবিক সুফলও ফলিতেছে। তাঁহাদের সঙ্ঘ জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে এবং সর্ব্বসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিয়াছে। তুমি এমন ধর্ম্মসঙ্ঘের ও নাম করিয়াছ, যাঁহাদের সঙ্ঘানুবর্ত্তীর সংখ্যা চমকপ্রদ ভাবে বাড়িতেছে কিন্তু যাঁহারা প্রত্যক্ষ কোনও জনসেবার কৃতিত্ব এখনো অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মানুষের মনে ছাপ পড়ে নাই। সঙ্ঘগুলির প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দর্শনে তোমার মনে নিজেদের সঙ্ঘটীর সম্পর্কে বিচার আসিয়াছে এবং হিসাব করিয়া

দেখিতেছ যে, তোমাদের সঙ্ঘটী এই সকল বড় বড় নামজাদা সঙ্ঘের কাছে কিছুই নহে। এই হিসাবের ফলে তোমার মনে নিদারুণ হীনমন্যতার উদ্ভব হইয়াছে এবং মনে মনে বিচার করিয়া দেখিতেছ যে, তোমাদের দ্বারা অনেক আগেই এক হাজারটা বিদ্যালয়, একশতটা কলেজ, পঞ্চাশটা হাসপাতাল, পঁচিশটা ধর্ম্মশালা এবং কমপক্ষে পাঁচটা বড় বড় অভ্রভেদী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়া উচিত ছিল।

উচিত যখন ছিল, তখন এই সকল কাজ সুসম্পন্ন করিবার জন্য এখনই তোমাদের লাগিয়া যাওয়া ভাল।

কিন্তু একটা কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছ যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর উচ্চ কাজ এক কথা নহে। তোমরা কাজের কথা যত বেশী কহিবে, কথার কাজ তত কম হইবে। ইহা উচিত, তাহা উচিত বলিয়া বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া যাহা যখন উচিত হইবে, তখনই তাহা সুরু করিয়া দিতে হইবে। ডিব্রুগড় রেল-কলোনী অখণ্ড-মণ্ডলীর ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে পত্র দিয়াছিলেন যে, কোনও একটা ব্যয়বহুল বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া একটা উচ্চ বিদ্যালয় গড়িবার জন্য তাঁহাদের হস্তে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হউক। বিশেষ অনুষ্ঠানটীর যাঁহারা উদ্যোক্তা, তাঁহারা নিজেদের পরিকল্পিত অনুষ্ঠানটী সমাপণ করিয়া ডিব্রুগড় রেল-কলোনির অখণ্ড-মণ্ডলীকে দশটী টাকাও দিতে পারেন নাই। কিন্তু রেল-কলোনির ছেলেরা এজন্য ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হন নাই। যাঁহাদের মনে সৎকার্য্যের প্রেরণা আসিয়াছে, তাঁহারা কি বসিয়া থাকিবেন? তাঁহারা ক্ষুদ্র আকারে একটী বিদ্যালয় যেমন তেমন করিয়া সুরু করিয়া দিলেন। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ সেই

শিশু বিদ্যালয়টী একটী উপাসনা-মন্দির ও সেবা-বিভাগ লইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এই ব্যাপারটী অনুধাবন কর। ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা দেখ। সৎকাজ করিব বলিয়া মনে হওয়া মাত্র ইঁহারা কাজে হাত দিয়াছেন। অন্যে আসিয়া এই কাজটী ইঁহাদের জন্য করিয়া দিয়া যাইবেন, এই বুদ্ধি ইঁহাদের মনে ক্ষণকালের জন্যও ঠাঁই পায় নাই। অন্য স্থান হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ আসিবে, তাহার পরে ইঁহারা কাজ ধরিবেন, এই কুরীতির ইহারা তোয়াক্কা রাখেন নাই। অতএব কাজ সত্য সত্যই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

তুমি যে সকল ধর্ম্মসঙ্ঘের নাম করিয়াছ, তাহাদের মধ্যে একটী সঙ্ঘের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আমি উহাদের শৈশবেই দেখিয়াছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় ভক্তেরা ছোটমোট ভাবে কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন এবং জনসাধারণের কাছ হইতে মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চাঁদা তুলিয়া তুলিয়া ক্রমশঃ জিনিষটীকে বাড়াইয়াছেন। বাড়িতে বাড়িতে জিনিষটী যখন বেশ দেখিবার মত হইয়া উঠিল, তখন সঙ্ঘের নেতারা মূলকেন্দ্র হইতে আসিয়া ভার নিলেন।

এইখানেই দেখা যাইতেছে, স্থানীয় কর্ম্মী বা সেবকদের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা হইতেই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল।

ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখ। ইঁহারা কেন্দ্র হইতে অর্থদাবী করেন নাই। কেন্দ্র আসিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া দিয়া যাউন, এই দাবীও করেন নাই। কেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ, শুভেচ্ছা এবং পরামর্শ ব্যতীত অন্য সাহায্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানও নাই।

তোমাদের কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী তাহা নহে। তোমরা প্রতি স্থানেই চাহিতেছ, আমি নিজে গিয়া কাজ সুরু করি। তোমরা চাহিয়াছ, আমি কেন্দ্র হইতে টাকা পাঠাইয়া জমি খরিদ করি, ঘর-বাড়ী তুলি। তোমরা চাহিয়াছ, কর্ম্মী তৈরী করিয়া আমি পাঠাইতে থাকি। তোমরা নিজেরা কর্ম্মী হইতে চেষ্টা কর নাই। তোমাদের অকূল সংসারের অশেষ কাজ দৈনিক এক ঘণ্টার জন্যও ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়া সেই কাজে হাত ছোঁয়াইতে পার নাই, যেই কাজটীর আশু আরম্ভ কর্ত্তব্য বলিয়া বারংবার তারস্বরে দাবী করিতেছ। কি কর্ত্তব্য আর কি অকর্ত্তব্য, তাহা বিচারের ভার নিজেদের উপরে রাখিয়াছ কিন্তু সেই কাজে হাত লাগাইবার ভার কি তোমরা ব্যতীত জগতের অপর সকলের উপর? ইহা সুস্থ মনোভাবের লক্ষণ নহে।

আমি ত' বাবা অযাচক-বৃত্তি ধরিয়া বড় কায়ক্লেশে কৈশোর-যৌবন ও প্রৌঢ় অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। যেখানে যতটুকু কাজ করিবার, নিজের শরীরকে খাটাইয়া করিয়া যাইবার চেষ্টা চালাইতেছি। বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য বা অন্যান্য নানাবিধ আরাম উপেক্ষা করিয়া অনলস প্রযত্নে শ্রম করিয়া যাইতেছি। আমার শ্রমে সাফল্য কিছু পাও, আর না পাও, ঐকান্তিকতার অভাব পাইবে না। কিন্তু জগতে আমি যে একাই কর্ম্মী রহিয়া গেলাম। তোমাদের বাহুগুলি আমার সহিত কাজে লাগিল কৈ?

আমার যৌবনে আমি অনেক অজ্ঞাত পল্লীর পথের মাটি কাটিয়াছি, অনেক এঁদো পুকুরের পানা-কচুরী পরিষ্কার করিয়াছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নৈশ বিদ্যালয় পরিচালন করিয়াছি। নৈশ বিদ্যালয়ের হারিকেন-

লণ্ঠন ও তৈল যোগাইবার জন্য স্বহস্তে লোকের পুকুরের মাটি কাটিয়াছি। সেদিন দেশে শ্রমদান-আন্দোলন ছিল না। তবু আমি শ্রম করিয়া সমাজের সেবা করিয়াছি, ধনীর দুলালদিগকেকে শ্রমের মর্য্যাদা শিখাইয়াছি।

কিন্তু তোমাদের যৌবন কিসের মধ্য দিয়া কাটিতেছে, তাহা বল!

বড় বড় প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখিলেই হইবে না বাছা, তার জন্য শ্রম চাই, দান চাই, ত্যাগ চাই। তোমরা শ্রম করিবে না, দানে কৃপণ হইবে, ত্যাগে হইবে কুণ্ঠিত। বল, বড় বড় প্রতিষ্ঠান কি আকাশ ফাঁড়িয়া নামিবে, না মাটি ফুঁড়িয়া উঠিবে? তোমাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িল না, কেবল জল্পনা, কল্পনা, গবেষণা করিতে করিতেই তালুর চুল সব উঠিয়া গেল, তোমরা বড় বড় প্রতিষ্ঠান দেখিবে কি করিয়া?

কথায় চিড়া ভিজে না। চিড়া ভিজাইতে জল চাই। ত্যাগ ছাড়া কোনও মহতী সৃষ্টি সম্ভব নহে। তোমরা কি ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইবে? নিজেদের নিজেরা জিজ্ঞাসা কর, অলস জল্পনা পরিহার করিয়া তোমরা সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য কবে হইবে স্বার্থত্যাগী?

নিজের ধন-সম্পত্তিকে রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিবার নাম ত্যাগ নহে। তাহাকে মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করার নাম ত্যাগ। তাহা তোমরা করিবে বা করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে কি? উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তাহা হইলেই ভরসার কথা।

আমি তোমাদের কাছে অর্থ সংগ্রহে কখনও চেষ্টিত নাই। জন-সাধারণের কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তোমরা আমাকে অর্থ

দাও, এই বিষয়ে আমার বরং নিষেধ রহিয়াছে। কিন্তু কোনও বড় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা বোধ করিলে তোমরা আমাকেই জোর করিয়া কেন চাপিয়া ধর যে, অমুক জিনিষ কেন এখনো গড়িয়া উঠিল না?

ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ নিজেদের ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন। তোমাদের মধ্যেও যদি তেমন করিয়া ত্যাগ-তপস্যার সমৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে, তোমরাও বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া জন-সমাজের সেবা করিবার গৌরব অর্জ্জন করিবে। ত্যাগ-তপস্যা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না দিয়া কেবল যদি কাঁদিয়া মর যে, কেন বড় বড় প্রতিষ্ঠান হইতেছে না, তাহা হইলে তাহাতে ত' কোনও লাভ হইবে না। সুতরাং লক্ষ্য দাও, কি করিলে তোমাদের ত্যাগ বাড়ে, তপস্যা বাড়ে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২২শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একজন সত্য সত্য সাধন-পথাশ্রয়ী হইলে তাহার চখে, মুখে, চলনে, বলনে এক দিব্য ভাবের দীপ্তি ফুটিয়া ওঠে। ফলে তাহার চারিদিকে যাহারা অবস্থান করে, তাহাদের মধ্যে জাগে সাত্ত্বিক আকর্ষণ,

জাগে ভালবাসা, জাগে সাধক-জীবনের অনিন্দ্য সংযমের অনুকরণ প্রবৃত্তি।

এই ভাবেই প্রকৃত সাধকেরা জগতের লোকের মনে দিব্যভাবের প্রেরণা দিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে জনসেবা করিয়া থাকেন।

এই জন্যই বলি, তোমরা সর্ব্বাগ্রে সাধনশীল হও। এর চেয়ে বড় কাজ জগতে আর কিছু নাই। যে অকপট চিত্তে সাধন করে, সে কেবল নিজের লাভই উঠায় না, জগতের সকলকে সে লাভবান্ করে। বিশেষ করিয়া, তোমার সাধন ত' জগন্মঙ্গলের সাধন। তুমি ত' নাম করিতে বসিয়াই আগেই সঙ্কল্প করিতে থাকিবে যে, তুমি যেন জগৎকল্যাণকারী হইতে পার, তোমার সমগ্র অস্তিত্ব যেন জগৎকল্যাণে সার্থক হয়।

তোমার সাধনশীলতা এই জন্যই অধিকতর কাম্য।

তোমার মামা-মামী এবং অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়েরা ইতিমধ্যেই তোমার সহিত সমসাধক হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। সমসাধকের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য লোকের পিছনে জোঁকের মত লাগিয়া থাকিয়া ক্যানভাস্ করার কোনও প্রয়োজন নাই। নিজে নিজের সাধন পূরা মন দিয়া করিতে থাক। তোমার মনের পূর্ণতা ও প্রশান্তি আপনা আপনি তাহাদিগকে তোমার সাধনার পরম পথে টানিয়া আনিবে, যাহারা এই পথে আসিলে তোমার নিঃশ্বাস বায়ু, তোমার পরিস্থিতি তোমার পরিস্থিতি, তোমার বাতাবরণ গভীরতর সাধনার অনুকূল হয়। নানা কৌশলে নিজেদের সমসাধকের

সংখ্যা বাড়াইবার যে রীতি দেশমধ্যে প্রচলিত দেখা যায়, তাহাতে দল বাড়িলেও, উহা তোমাদের পন্থা নয়। তোমরা অকপটে নিজ নিজ সাধন করিয়া যাইতে থাক। ইহার ফলেই তাহারা আপনা আপনিই তোমাদের সন্নিহিত হইবে, যাহারা তোমাদের আপন জন।

প্রকৃত আপন জনকে কখনও অনেক করিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে হয় না। আপনার জন আপনা আপনি আসে। তবে তার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়, তপস্যা করিতে হয়। "কে আছ কোথায় আপন, ছুটিয়া আইস" বলিয়া তপস্যা করিতে হয় না, "হে ভগবান্, আমাকে নিখিল ভুবনের মঙ্গল-কাজে নিয়ত নিয়োজিত রাখিয়া ধন্য কর",—এই প্রার্থনাই আপনার জনকে পাইবার তপস্যা।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচারকেরা নিজ নিজ সংস্থার বিশেষ বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দিকে নিজেদের অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছেন বলিয়া তোমরা তাঁহাদের প্রতি মাৎসর্য্যপরায়ণ হইও না। এ জগতে সকলেরই অধিকার আছে নিজ মত প্রচার করিবার এবং সেই মত প্রচারের প্রতক্ষ্য ফলস্বরূপ নিজেদের অনুবর্ত্তীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার। এই অধিকার হইতে তোমরাও বঞ্চিত নহ। অপরে যেই অধিকার গ্রহণ করিতেছেন, যেই অধিকারের প্রয়োগ করিতেছেন, তুমি সেই অধিকার তোমার তরফ হইতে প্রয়োগ করিলে যদি তাঁহারা রুষ্ট হন, তবু তোমার অধিকার তোমারই। তবে তোমার প্রচারের রীতি আলাদা। সকলের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে আপনা আপনি যাহারা তোমাদের বক্ষ-সন্নিহিত হইবে, তাহাদের মধ্যেই নিজেদের

প্রচার-চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখিও। জগতের কুশল-মূলক আধ্যাত্মিক বা সামাজিক সেবা তোমরা নিরঙ্কুশ গতিতে করিয়া যাও।

লোকে কি বলিবে ভাবিয়া নিজের দৈনিক ব্যায়াম ও উপাসনা বন্ধ করিও না। একটু একটু করিয়া প্রত্যহ একটা কাজ করিলে একমাস পরেই টের পাওয়া যায় যে, তাহার কি শুভময় ফল ফলিয়াছে। উপাসনার আলাদা স্থানের ব্যবস্থা যদি না করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পড়ার বা কাজ করিবার স্থানকেই একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনার স্থানে পরিণত করিয়া লইবে। উপাসনায় বসিবার জন্য একখানা আলাদা আসন রাখিবে। এই আসন একমাত্র উপাসনা ব্যতিত অন্যকাজে ব্যবহৃত হইবে না। এই আসন অকারণে অন্য লোককে ধরা-ছোঁয়া করিতে দিবে না। এই আসনে বসিয়া কোনও কুচিন্তা বা বাজে চিন্তা করিবে না বলিয়া একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া নিবে।

সকল কাজের জন্যই সময় হইবে। কেবল ঈশ্বর-সাধনের জন্যই সময় হইবে না, ইহা অন্যায় কথা। যাহাতে মানুষ কিছুতেই তাহার এই আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যটী ভুলিয়া যাইতে না পারে, এই জন্যও এই বিধান হইয়াছিল যে, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলস্পর্শও করা চলিবে না। অবশ্য, উদর খালি থাকিলে মনঃসংযোগও সহজে হয়। আহারের পরে ধ্যান-জপে বসিলে আলস্য আসে, ঘুম পায়, ইহাও অন্যতর কারণ।

তুমি তোমার উপাসনাটুকু অবশ্যই নিয়মিত করিও। জমি বন্দোবস্ত নিয়া যাহারা চাষ-আবাদ করে না, পুস্তক কিনিয়া যাহারা তাহা না

পড়িয়াই আলমারিতে তালা-বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়, দীক্ষা নিয়াও যাহারা উপাসনা করে না, তাহাদের অবস্থা ঠিক একই রূপ। এই কথাটী মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৩শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ভগবানের নামে দীক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। এদেশে দীক্ষা একটা বদ্ধমূল সংস্কার এবং দীক্ষা না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না বলিয়া জনসাধারণের একটা প্রবল বিশ্বাস আছে। এই দুই কারণ যদি তোমাকে দীক্ষার দিকে ঠেলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে দীক্ষা নিতে আরও কিছুকাল দেরী কর। প্রতীক্ষা দ্বারা নিজের মনকে পাকা-পোক্ত করিয়া লও। সম্ভব হইলে গুরু-পরীক্ষা করিয়াও ভবিষ্যতের বৃথা সন্দেহের ঝুঁকিগুলি কমাইয়া লও। প্রাণ যখন দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার আগে শুধু ঝোঁকের বশে দীক্ষা নেওয়া কাহারও উচিত নহে। হুজুগকে দীক্ষা নিয়া কদাচিৎ কেহ কেহ যে বিশেষ লাভবান হন নাই, তাহা নহে,

পরন্তু এই সব ব্যতিক্রম-স্থলীয় দৃষ্টান্তের জোরে হুজুগকে সমর্থন করা সঙ্গত নহে।

তুমি যদি সঙ্কল্প করিয়া থাক যে, ঈশ্বর-সাধনে ফাঁকি দিবে না, গুরুদত্ত সাধন অবিচল বিক্রমে আমৃত্যু করিয়াই যাইবে, তাহা হইলে তুমি প্রায় নির্ব্বিচারে নিজের অভিলষিত বা মনঃপূত যে-কোনও মহাজনের আশ্রয় নিতে পার। অমুকের পথ উৎকৃষ্ট বা তমুকের পথ নিকৃষ্ট, এই সব বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। সকল পথেই ভগবানকে পাওয়া যায়। জগতের সকল মতাবলম্বীরাই ভগবানের পরম করুণার অধিকারী হইবেন। প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে কসুর না থাকিলে সকল মতের মতীরাই তাঁহাকে পাইবেন। তবে দীক্ষা নিবার আগে তোমার বিচার প্রয়োজন শুধু এইটুকুর যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট একটা দলে ভিড়িবার ফলে ধর্ম্মের নামে কোনও অধর্ম্ম, অনাচার, অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা, পাপ, দুর্নীতি বা ব্যভিচার ত' তোমার জীবনে আসিবে না? অনেক সদ্ধর্ম্মবলম্বী সম্প্রদায়েও দীক্ষা নিবার পরে দেখা যায়, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম না বাড়িয়া ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, বাড়িয়া যায়। দীক্ষা নিয়া এমন সকল সম্প্রদায়ের কবলে পড়া লাভজনক নহে।

আমার এখানে দীক্ষা নিবার জন্য আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ দিতে পারিতেছি না। তুমি খোলা মনে পৃথিবীটা ভ্রমণ করিয়া দেখ। সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও প্রেমের দৃষ্টিতে নানা স্থানের লোকপাবন পুরুষদের চরণ-প্রান্তে তাকাও। সস্নেহ ও সপ্রেম অন্তরে তাঁহাদের প্রচারক ও শিষ্যদের আবরণ ও আচরণগুলি লক্ষ্য কর, আগে দেখ, জগতের

কোনও মত, কোনও পথ, কোনও সংস্রব তোমার প্রাণের পিপাসা মিটায় কিনা। যদি মিটায় বলিয়া অনুভব কর, তবে নিঃসঙ্কোচে সেখানে দীক্ষিত হইয়া যাও এবং পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাধন-পথে চলিতেই থাক। যখন দেখিবে, পৃথিবীর কোনও সম্প্রদায়ে তোমার স্থান হইল না, তখন আমার প্রতি তোমার প্রাণের দীর্ঘপোষিত প্রেমকে স্মরণ করিয়া আমার কাছে আসিতে পার। তখন আমি তোমাকে মন্ত্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার রুগ্ন পুত্র দ্রুত নিরাময় হউক, এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তাহাকে নিয়ত উৎসাহ দাও। তাহাকে প্রতিক্ষণ স্মরণ করিতে বল যে, জগতের সুমহৎ কল্যাণ-সাধনের জন্য তাহার জন্ম হইয়াছে। সে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণে রাখে যে, তাহাকে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। এজন্য তাহাকে সুস্থ হইতে হইবে, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে হইবে, সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি-বিপর্য্যয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া জগতে জয়ী হইতে হইবে।

দুরবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পার, কিন্তু পুত্রকে উৎসাহ দিবার বেলায় দুর্ব্বল হইও না। এই কিশোর বালক কত সম্ভাবনার অধীশ্বর, তাহা আজ কেহ জান না। চতুর্দ্দিকে যখন ঘনঘটা, তখন মাতাপিতার উৎসাহ ইহার সাহসকে উদ্দাম করিবে। সাহসীরাই জগতে দিগ্বিজয় করে। পুত্রকে সাহসী কর।

নির্ভীক মন আর অসমসাহসী বুদ্ধি আসে ঈশ্বরবিশ্বাস হইতে। পুত্রকে তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসী কর। ঈশ্বরে তার এমন বিশ্বাস হউক, যাহা ঈশ্বরদত্ত বাহু ও বুদ্ধি-বলের পূর্ণ প্রয়োগ করে, যাহা জীবনের প্রতি কর্ম্মকে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে সম্পাদন করায়।

মানুষ আর পশুতে অন্য কয়েকটা পার্থক্যের মধ্যে ইহাও এক সুমহৎ পার্থক্য যে, পশু অনেক কাল অতীতের স্মৃতি বহন করিতে পারে না। পূর্ব্বপুরুষদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সমূহের বিচিত্র সংগ্রহ সম্ভব করিতে ও কাজে লাগাইতে পারে না, কোনও মহান্ সঙ্কল্পকে সুদীর্ঘ প্রয়াসে ধারাবাহিক ভাবে পোষণ করিতে পারে না। মানুষের পক্ষে এই তিনটী কাজই সহজ। এমন তিনটী সুযোগ পাইয়াও আমরা পরমেশ্বরের সেবায় মন দিব না, তাঁহাকে এই একটা জীবনের মধ্যেই সাক্ষাৎ দর্শন করিবার জেদ করিব না, ইহা পরম পরিতাপের বিষয়। তোমার পুত্রকে সেই সুমহান্ সঙ্কল্প করাও, তোমরা স্বামি-স্ত্রী দুই জনেও সেই সঙ্কল্প কর।

সাংসারিক কোনও স্বার্থের জন্য ভগবানকে তোমাদের প্রয়োজন নহে। তাঁকে প্রয়োজন জগতের সকলের স্বার্থে। জীবে তোমাদের দয়া হউক, সেই দয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলুক তোমাদের নামে রুচি।

সম্প্রতি তোমরা স্বামি-স্ত্রী আমাকে দর্শন-মানসে যেখানে গিয়াছিলে, সেখানে আমি যাহা যাহা করিয়াছি বা করাইয়াছি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের মনকে সর্ব্বকর্ম্মের অবসরে ঈশ্বরমুখী করা, জীবের প্রতি পরমপ্রেমে অভিভূত হইয়া তাহাদের হিতার্থে ঈশ্বরপ্রীতিতে কাজ করা। ক্রিয়াযোগ আর কর্ম্মযোগ মানুষের একসঙ্গে চলিবে।

প্রতিটি স্বাভাবিক শ্বাস আর প্রশ্বাসকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত জানিয়া তাহাদের সহায়তায় নিয়ত নিজের সহিত পরমেশ্বরের যোগ-সাধন এবং পরমেশ্বরের সহিত নিজের যোগসাধনকে কোনও কোনও ধর্ম্মাচার্য্যের সম্প্রদায়ে ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত করা হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মহাপুরুষগণের সম্প্রদায়ে ইহা শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-যোগ বলিয়া কথিত হয়। সাধকদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে স্বাভাবিক যোগ নাম দিয়াছেন। পল্লীগ্রামে বিভিন্ন ক্ষুদ্র-বৃহৎ সম্প্রদায়কে ইহার হংস-যোগ নাম দিতে শুনিয়াছি। শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়াকে স্বাভাবিক থাকিতে দিয়া তাহারই মধ্যবর্ত্তিতায় নিয়ত ঈশ্বর-স্মরণ এবং কখনো শরীর-বুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ, কখনও শরীর-বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া স্বশরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরমেশ্বরের দিব্য স্থিতি চিন্তন ক্রিয়া-যোগেরই কৌশল। এই ক্রিয়াযোগের সহিত কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে।

এদেশে ধর্ম্ম করিতে হইলেই মানুষ কর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সত্য সত্য ঈশ্বর-চিন্তন প্রগাঢ় হইলে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম অনেকটা আপনা আপনিই কমিয়া যায়, ইহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু ঈশ্বর-সাধনকারীদের এদেশে এত সহজেই প্রতিপত্তি লাভ হইয়া থাকে যে,

আস্তে আস্তে জীবনের কর্ম্ম হইতে অবসর নিয়া সাধকেরা তাঁহাদের ভাবনা সমাজকে ভাবিতে বাধ্য করেন। কিন্তু যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর আদর্শাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নানা বিচিত্র বিচারের স্থান হইতেছে। ঈশ্বর-সাধনও করিব, জগতের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ হইতেও পরাঙ্মুখ হইব না, ইহাই এই যুগের দাবী। এই জন্যই ক্রিয়াযোগের সঙ্গে কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্যের একান্ত প্রয়োজন।

তোমরা সাধকও হইবে, কর্ম্মীও হইবে। কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইবে মহৎ এবং তাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের স্থান থাকিবে অত্যল্প। যতটুকু ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকিলে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব, ততটুকু ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেহ দূষ্য মনে করে না। তোমার সাধনও চলিবে বিশ্বহিতার্থে, তোমার ব্যক্তিত্বও থাকিবে জগজ্জনেরই কল্যাণ সাধনের জন্য। ভিতরে বাহিরে তুমি ঈশ্বরের হইবে এবং ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ তুমি দেহ দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা জগজ্জনের সেবা করিবে।

মনকে খাঁটি করিবার দিকেই আগে লক্ষ্য দিবে। মনকে নিয়াই ত' বিশ্বের যত খেলা। জগতে হাত, পা, মুখ, চখ, নাক, কান দ্বারা প্রকৃত মহৎ কাজ যতটা হইয়াছে, তার শত গুণ হইয়াছে ঈশ্বরনিষ্ঠ স্নিগ্ধ-শান্ত পবিত্রসুন্দর মনটী দ্বারা। হাতে পায়ে কোনও কাজ করিতে না পারিলেও যদি মনে মনে নিয়ত সঙ্কল্প কর যে, তোমরা জগতের কল্যাণ করিবে, তাহা হইলে সেই সঙ্কল্প তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে হইতে এমন এক ঐশী শক্তির সৃষ্টি করিবে, যাহা বিপুল বেগে ব্রহ্মাণ্ডের আনাচে কানাচে ভ্রমণ সুরু করিবে এবং অনুকূল পাত্র

পাইলেই তাহার ভিতরে সৎসঙ্কল্পের বীজ বপন করিয়া যাইবে। ঘরে বসিয়া জগৎকল্যাণেচ্ছাকে বিশ্বময় পরিচালিত করিয়া যাইবার যোগ্যতা যে তোমাদের আছে, ইহা তোমরা বিশ্বাস কর।

তোমাদের উপাসনার পদ্ধতিটি এমন একটি জিনিষ যে, ধারাবাহিক যদি ইহার আদ্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিন চারি পুরুষ ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তোমাদের এক একটা বংশের মধ্যে ক্রমশঃ অনেক দিব্য পরিবর্ত্তন আসিয়া যাইতে থাকিবে। এইজন্যই আমি তোমাদের দুই একজনকে বলিয়াছি যে, নিজেরা যে সাধন করিতেছ, নিজেদের পুত্রকন্যাগুলিকে সেই সাধনের প্রতি একান্তভাবে শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোল, তাহাদের কাহাকেও ভিন্ন মত বা ভিন্ন পথ চাখিবার প্রবৃত্তির দ্বারা প্রলুব্ধ হইতে দিও না। শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালীখানা আদ্যোপান্ত ভালভাবে পাঠ করিয়া দেখিও যে, কেমন ভাবে একটা বলদুদ্ধর্ষ নবমহাজাতি সৃষ্টির গুপ্ত-রহস্য ও নিগূঢ় আয়োজন ইহার ভিতরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তোমরা যে দুই একজন একাগ্র মনে এই সাধন করিয়া যাইতেছ, তাহারা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে এই সাধনের রহস্যের প্রতি অবশ্যই আকৃষ্ট করিবে। তোমাদেরই শুক্র-শোণিত নিয়া তোমাদের পুত্রকন্যারা আসিয়াছে। তোমাদেরই অনুসৃত সাধন-পথ অনুসরণ করিলে ইহাদের শরীরের আণবিক পরিবর্ত্তনগুলি দ্রুততর হইবে। ইহাদের সন্তানেরা আবার এই সাধন-পথেই চলিলে তাহা হইবে আরও দ্রুততর। তিনপুরুষ পরে ইহা অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা যাইবে যে, জগতে এমন এক নূতন জাতির মানুষ আবির্ভূত হইয়াছে

যাহারা একটী প্রাণীরও অকুশল চিন্তা করে না এবং নিজেদের স্বাভাবিক সংসার-ধর্ম্ম পালন-কালেও জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতে জগতের হিতই সম্পাদন করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ঈশ্বরের দয়া ছাড়া এত প্রেম-ভক্তি কাহারও হয় না। প্রেমিকের সঙ্গ করিয়া মানুষ প্রেমিক হয়, প্রেমিকের ধ্যান ও তাঁহার দিব্য লীলার অনুচিন্তন করিয়া লোকে প্রেমিক হয়, নিয়ত সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে চিত্তের বৃত্তি সমূহ ক্রমশঃ কোমল হইতে কোমলতর হইয়া লোকে প্রেমিক হয়। তখন সেই প্রেমের আর পারকূল থাকে না। সমস্ত দেহ মন ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিয়া ভগবানের মধ্যেই নিজস্বতা হারাইয়া প্রেমিক তখন এক দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে।

সেই আনন্দ বিশ্বভুবনে অকাতরে অকপটে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিলাইয়া দিবার জন্যই পাইয়াছ মানব-জীবন। সুতরাং ভগবৎ-প্রেম যাহাতে অন্তরে নিয়ত জাগরূক থাকিতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা অবহিত থাকিও।

হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে সর্ব্বত্র কেবল ভগবৎ-প্রেম-রস-মধু আহরণের জন্যই উৎকণ্ঠ হইয়া থাকিও। মানুষের চীৎকারে, তর্জ্জ নে, গর্জ্জ নে, রোদনে, উল্লাস-ভাষণে সর্ব্বত্র ভগবানের প্রেমের কথাই শ্রবণ করিবার দিকে উৎকর্ন থাকিও। সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া প্রেম কর আহরণ, প্রেমে কর সঞ্চরণ, প্রেমের দেখিও স্বপন, প্রেমে হউক তোমার জাগরণ। অভ্রান্ত অলির ন্যায় অক্লান্ত উড্ডয়নে প্রেম-গুঞ্জন করিতে করিতে ফুলে ফুলে কর প্রেম-মকরন্দ আহরণ।

ইহা তোমার দিবসরাত্রিব্যাপী সর্ব্বকালীন কর্ম্মতালিকা। কিন্তু ইহার জন্য প্রাত্যহিক নৈষ্ঠিক কর্ম্মতালিকা পরিত্যাগ করিও না। প্রত্যহ ঠিক সময়ে উপাসনায় বসিবে। উপাসনায় বসিবার আগেই যাহাতে মনে উপাসনার নেশা জাগিয়া উঠে, তাহা করিবে। নেশার ভাব না আসিলে কি কোন কাজে মজা যায়? মদ, গাঁজা, ভাঙ প্রভৃতি নেশার প্রয়োজন তোমার ন্যায় সাধকের নাই। কিন্তু উপাসনার নেশা জমান চাই। নূতন প্রণয়িণী প্রণয়ি-সন্দর্শনে যাইবার আগে দেহ-মন-প্রাণে যে অপূর্ব্ব শিহরণ অনুভব করিতে থাকে, উপাসনার আসনটিতে বসিবার আগেই তোমাকে মনের ভিতর সেই ভাব জাগাইয়া লইতে হইবে।

উপাসনার আসনটিতে বসিয়া বিগ্রহের পানে কিছুকাল স্থির দৃষ্টিতে তাকাইও। মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়া লক্ষ্য করিও যে, পরিদৃষ্ট বিগ্রহের প্রতিচ্ছবি মনের কোণে ভাসিয়া উঠিতেছে কিনা। কিছুকাল বিগ্রহের দিকে এক লক্ষ্যে তাকাইয়া থাকা বড়ই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অপরে যখন অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিতেছে, তুমি তখন বিগ্রহের দিকে লক্ষ্য দিও। ঐ একটি ছবিকে অন্তরে আঁকিয়া রাখিতে হইবে বলিয়াই এক

স্থানে দুইটী বিগ্রহ বসাইবার নিয়ম নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরুদেবেরা একই উপাসনা-স্থানে পাঁচটী, দশটী, পঞ্চাশটী দেবতা বা মহাপুরুষের প্রতিচিত্র সমাবিষ্ট হইতে যে কারণে সম্মতি দেন, তোমাদের ব্যাপারে সেই কারণের অসদ্ভাব রহিয়াছে। তোমাদের বিগ্রহ ওঁকারের ভিতরে সর্ব্ব-বিগ্রহ বিরাজিত। সুতরাং ইঁহার উপরে, নীচে, দক্ষিণে, বামে কোনও স্থানেই অপর কোন বিগ্রহ বসাইবার প্রয়োজন নাই। কেহ যদি বলে "নিষ্প্রয়োজনেই আমি অন্য একটি চিত্র বসাইব", তাহা হইলে আমি তাহাতে নিষেধ জানাইতেছি। শ্যালক, বৈবাহিক প্রভৃতি কুটম্বগণের সঙ্গে সাংসারিক শিষ্টাচার যেমন ব্যাপার, ভগবদুপাসনা তেমন ব্যাপার নহে। শ্যালক বৈবাহিক আদিকে খুশী করিবার জন্য অনেক সময় লোক-প্রথার গণ্ডীর বাহিরেও যাইতে হয়। অবস্থা-ভেদে উহাকে লোকে দোষণীয় মনে করে না। কিন্তু ভগবদুপাসনার ব্যাপারে সাংসারিক কুটুম্বিতার কোন স্থান নাই। ইহা তোমার জীবনের সব চাইতে গুরুতর ব্যাপার। ইহার মধ্যে রামকে খুশী করার, শ্যামকে সন্তুষ্ট করার, যদুকে দলে রাখার বুদ্ধি প্রশস্য নহে। এই ব্যাপারে পাঁচ জনের বুদ্ধি না নিয়া গুরূপদিষ্ট প্রণালীই অবলম্বনীয়। আপোষ-রফা হয় রাজনৈতিক ব্যাপারে, আপোষ-রফা চলে সামাজিক ব্যাপারে। নিজের নিগূঢ় সাধন-ধর্ম্মের ব্যাপারে আপোষ-রফার কোনও প্রবেশাধিকার নাই।

তোমার গুরুভ্রাতাদের প্রায় একশতটি উপাসনা-গৃহ আমি আমার সাম্প্রতিক এক ভ্রমণকালে দেখিয়াছি। মাটি, কাঠ ও পাথরের মূর্ত্তি, পট এবং মুদ্রিত ছবি সকল মিলিয়া ঠাকুর-ঘরখানা যেন যাদুঘর

হইয়াছে। অর্থাৎ সেখানে পাওয়া যাইবে না, এমন কোনও দর্শনীয় ছবি নাই। ভারতবর্ষে যত সম্প্রদায় যত প্রতীক অবলম্বন করিয়া সাধন-ভজন করিয়া থাকেন, সকলের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটি করিয়া মূর্ত্তি বা ছবি ঠাকুর-ঘরে আছেই। ইহাই যদি হয় অবস্থা, তাহা হইলে ধ্যান করিবার সময় চোখ বুজিবামাত্র মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি আসিয়া ভিড় করিতে থাকিবে না কেন? কোনও মূর্ত্তিই উপেক্ষার নয়। কিন্তু তুমি যে একনিষ্ঠাচ্যুত হইলে! প্রেম কখনও একনিষ্ঠা ছাড়া আসে না, ধ্যান কখনও একনিষ্ঠা ছাড়া জমে না, জন্ম-মরণ-দুঃখ-বিদূরণের রাস্তা একনিষ্ঠারই মধ্য দিয়া।

যে যেই দেবতার উপাসনা করে, সে সেই দেবতার ধ্যানের মধ্য দিয়াই জীবনের চরম ও পরম লভ্যকে আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু একজন যদি বহুদিকে মনঃসঞ্চালন করে, তাহা হইলে ইহ-জীবনেও বা কোটি জন্মেও সে পরম লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিবে না। তবে যদি কেহ বলে, "লক্ষ্যে আমি পৌঁছিতে চাই না কিন্তু বহু দেব, বহু দেবী, বহু ধ্যান, বহু মন্ত্র ইত্যাদি লইয়া নাচিয়া কুঁদিয়া আনন্দ পাই, সুতরাং আনন্দ আমি করিবই, তোমার তাহাতে কি যায় আসে,"—তবে আর আমার বলিবার কিছু নাই।

ওঙ্কার-মন্ত্র সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বমন্ত্রময়, সর্ব্বশুভময়। সুতরাং এই মন্ত্রের স্মারকরূপে যেই প্রতীক-বিগ্রহ তোমাদের উপাসনা-স্থানে রাখিবে, সেখানে অন্যান্য বিগ্রহের সমাবেশ করিও না। সব মতই সত্য, সব পথই সত্য। কালী, দুর্গা, গণেশ, শিব কেহই মিথ্যা নহেন। যীশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য ইঁহারাও মিথ্যা নহেন। বেদ, বাইবেল, কোরাণ,

গীতা ইঁহারাও মিথ্যা নহেন। কোনও কিছুকে মিথ্যার অপবাদ না দিয়াও তোমাকে একনিষ্ঠই থাকিতে হইবে। নিষ্ঠাহানি সাধনের গুরুতর শত্রু। এক নামে, এক মতে, এক পথে লাগিয়া থাকিয়া যে জাহান্নমে যাইতেও রাজী থাকে, সেই ত' প্রকৃত সাধক। সাধকই প্রয়োজন, পল্লবগ্রাহীর প্রয়োজন নাই

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের নাম করিয়া তুমি তোমার পূজার পীঠস্থানে আজ আনিয়া করিতেছ যীশুর পূজা, কাল বুদ্ধের পূজা, পরশু শীতলার পূজা, তারপরের দিন কালী-পূজা, তারপরের দিন লক্ষ্মী-পূজা,—এই ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পূজা মহা-আড়ম্বর সহকারে করিয়া গেলে। যার যার দেবতার যখন পূজা হইতেছে, তখন সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশ আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া আনন্দ করিয়া গেলেন। কিন্তু ইহার ফলে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় হইল কি? না, পল্লবগ্রহিতা হইল? যে কোনও একটা উপলক্ষ্য করিয়া ভগবানের দিকে যে মতি গেল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং ইহা একটা লাভ। কিন্তু চূড়ান্তভাবে একটা পথ ধরিয়া চলিলে যে সুগভীর ধ্যানাবেশ হয়, সেই ধ্যান জমিল না এবং তাহার ফলে "সব ঠাকুরই এক ঠাকুর" এই উপলব্ধিটাও আসিল না।

"সব ঠাকুরই এক ঠাকুর। অতএব সব ঠাকুরকে পূজা করিলেই এক ঠাকুরের পূজা হয়। অতএব আমরা সব ঠাকুরেরই পূজা করিব।"—বল, যুক্তিশাস্ত্রে ভুলটা হইল কোথায়?

কিন্তু কেহ যদি বলে, "সব ঠাকুরই এক ঠাকুর, অতএব এক ঠাকুরকে পূজা করিলেই সব ঠাকুরের পূজা হয়; সুতরাং আমরা বহু

ঠাকুরের পূজা লইয়া মাথা না ঘামাইয়া এক ঠাকুরেই মজিব, এক ঠাকুরকেই ভজিব, এক ঠাকুরকেই পূজিব,"—তাহা হইলেই বা যুক্তি-শাস্ত্র মাঠে মারা যাইবে কেন?

এক জায়গায় বিশ হাত খুঁড়িলে কূয়াতে জল মিলে। চল্লিশ জায়গাতে পাঁচ হাত পাঁচ হাত করিয়া খুঁড়িয়া গেলে মোট দুই শ হাত খুঁড়িলেও জল মিলে না। এই একটা দামী সত্য আমি কাহাকেও বুঝাইতে পারি নাই। শক্ত শক্ত মাথা যেন নিমেষে পচা গোবরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কেহ বলে,—"বাল্য-সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারি নাই," কেহ বলে,—"বৌমার অনুরোধে অমুক পূজা করিয়া থাকি", কেহ বলে,—"খোকারামের আতুর ঘরে জোড়া পাঁঠা দিয়া শীতলা পূজা করিব বলিয়া মানসিক করা আছে।" কেহ বলে,—"অমুক সোসাইটির বই পড়িয়াছিলাম, কেমন করিয়া জানি একটা কথা মনের ভিতর বসিয়া গেল, এইজন্য অমুক অমুক মূর্ত্তি ছাড়িতে পারিতেছি না।" কেহ বলে,—"গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা পাথরের নুড়ি খুঁজিয়া পাইলাম। কেহ বলিয়াছেন, ইহা শালগ্রাম শিলা, কেহ বলিয়াছেন ইহা বাণলিঙ্গ শিব। দুইটার একটা নিশ্চয়ই হইবেন, এইজন্য ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া আন্দাজে পূজা করিতেছি।"

এইভাবে ঠাকুর-ঘরে বিগ্রহের পর বিগ্রহ বাড়িতেছে আর জমিতেছে। কিন্তু ভাবের ঘরে কড়ি জমিতেছে না। ভাবের ঘরে কড়ি না জমিলে, ধর্ম্ম নিয়া মিথ্যা ভানের প্রয়োজন হয়। ভাবের ঘরে কড়ি না জমিলে, ধর্ম্মজীবনের সহিত কর্ম্মজীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যায় না। ফলে ধার্ম্মিককে হইতে হয় ভিক্ষুক আর ভিখারীকে

সাজিতে হয় ধার্ম্মিক। ফলে, দল লইয়া ধার্ম্মিকদের ঈর্ষা, মারামারি, প্রতিযোগিতা সব আরম্ভ হয়। ভাবের ঘরে কড়ি না জমিলে সমসাময়িক অপরাপর ধার্ম্মিকদিগকে ছোট করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়। নবপন্থা-প্রদর্শনকারীদিগকে সুকৌশলে কৃষ্টি ও সভ্যতার, সংস্কৃতি ও সমুন্নতির, সংহতি ও শান্তির শত্রু বলিয়া অপপ্রচার করিতে ভাল লাগে। ভাবের ঘরে কড়ি না জমিলে অন্যান্য ধর্ম্মসংঘের প্রতিপত্তি দেখিলে মনে মনে বৃথা আশঙ্কা জন্মে যে, ইহারা বুঝি বাজারের বনেদি দোকানদারদিগকে প্রতিযোগিতায় হঠাইয়া দিয়া বিচারবুদ্ধিহীন মূর্খ খরিদ্দারদিগকে ভাগাইয়া লইবে। এই জন্যই বলিতেছি যে, তোমরা ভাবের ঘরে চুরি রাখিও না। অর্থাৎ নামে শুধু "অখণ্ড" না রহিয়া সত্য সত্য "অখণ্ড" হও। "অখণ্ড" সংজ্ঞাটা বড় সম্মানিত সংজ্ঞা। একনিষ্ঠ ভাবে সাধন করিয়া তোমরা এই সংজ্ঞার মর্য্যাদা রক্ষা কর। বহু-পথ-চারীদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত না হইয়া নিজেদের একনিষ্ঠার গৌরবে গৌরবান্বিত হও। তোমাদের বড় বড় পঞ্চাশটা মঠ হয় নাই বলিয়া তোমরা ছোট হইয়া আছ, এই ধারণা বর্জ্জন কর। বড় বড় মঠ-স্থাপনে আনুকূল্য পাইবার জন্য জনসাধারণের মানসিক মুদ্রাদোষগুলির তোয়াজ করিতে হইবে, এই ভ্রান্তি তোমরা পরিত্যাগ কর। যেই দিন আমি অনুভব করিয়াছিলাম, জীবন ধারণের জন্য ত' নহেই, এমন কি জনকল্যাণ সাধনের জন্যও ভিক্ষার রাস্তায় চলিব না, সেই দিনই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে, জনসাধারণের ব্যক্তিগত জেদ, পারিবারিক রুচি, সাম্প্রদায়িক রীতি প্রভৃতির সহিত কলহ করিবারও প্রয়োজন নাই, আপোষ করিবারও আবশ্যকতা নাই। তোমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে পরমেশ্বরের শ্রীচরণে। ভগবানের

যদি ক্ষমতা থাকে, পঞ্চাশটা মঠ তোমাদেরও হইবে। ভগবানের অপেক্ষা অল্পশক্তিধর কাহারও বন্দনা আমরা করিব না। লোকমত, সামাজিক রুচি, ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী কি ভগবানের ইচ্ছা হইতেও শক্তিমান? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৪শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসুঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। তোমার স্বামীর বসন্ত রোগ হইয়াছে জানিয়া চিন্তিত হইলাম। এই রোগটার বড় জ্বালা। রুগ্ন ব্যক্তির রোগ আরও দশজনে সংক্রামিত হইবার ভয় আছে বলিয়া ইহা সান্ত্বনাহীন এক শাস্তিস্বরূপ। তবু ভয় পাইও না মা। মঙ্গলময় ভগবানকে স্মরণ কর এবং সম্ভবমত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

মা শীতলা নামে এক দেবতার খাইয়া দাইয়া আর কোনও কাজ নাই, গাধার পিঠে চড়িয়া তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মানুষের উপরে ভর করিবেন আর তাহাতে বালক-যুবক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে দলে দলে বসন্তে আক্রান্ত হইবে,—এই সকল গল্পগাছায় বিশ্বাস করিয়া শীতলা নামধারিণী অতীতকালের কোনও এক মহা-মানবীর বিরুদ্ধে অসম্মান-সূচনা করিও না। যিনি দেবতা, তিনি মানুষের পূজা পাইবার লোভে

কেবল জীবের উপরে উৎপীড়ন করিয়া যাইবেন, ইহা দেবোচিত স্বভাবও নহে। পিত্তের প্রকোপ হইয়া শরীরে মসূরিকা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সুচিকিৎসায় অধিকাংশ বসন্ত-রোগী নিরাময় হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বসন্তের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করিয়াছে এবং আমাদের বাল্যকালে আমরা বাংলা টীকাতেও রোগ প্রতিসিদ্ধ হইতে দেখিয়াছি। বৃথা একজন কাল্পনিক দেবতাকে আনিয়া এই রোগের কারণরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁর সম্পর্কে অন্তরে কল্পনাতীত আতঙ্ক পোষণ করিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার পূজা দিয়া রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কামনার প্রয়োজন কি? সত্য সত্য শীতলা দেবী আজ যদি জীবিত থাকিতেন এবং দেখিতেন যে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এত রকমের উদ্ভট গল্পগাছা তৈরী করা হইয়াছে আর সেই সকল গল্পের ভীষণতা দ্বারা সরল-স্বভাব নরনারীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া সেই আতঙ্কের সুযোগে কতকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া একদল পূজারীর সংসার-প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি কতখানি সুখী হইতেন, তাহা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারা বিচার করিয়া দেখ। আমার মনে হয়, একদা এক অন্ধকার যুগে ভারতের কোনও এক প্রান্তে এক অনার্য্য-জাতির অধ্যুষিত সমাজে বসন্ত মহামারীর প্রাদুর্ভাব-কালে একটী মহাপ্রাণ মহিলা বসন্ত রোগীদের সেবা ও ঔষধ প্রয়োগের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমণ করিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। আর সেই পবিত্রমধুর ইতিহাসই ক্রমশঃ বিকৃত হইতে হইতে এমন বিদ্‌ঘুটে আকৃতি পাইয়াছে।

তোমরা মা শীতলা, মা মনসা, মা কালী প্রভৃতি সম্পর্কে

আতঙ্কমূলক উপকথাগুলি বিশ্বাস করিতে বিরত হও। দেবতা হওয়া ত' দূরের কথা, সাধারণভাবে যিনি কাহারও মা হন, তাঁরও সাধ্যে থাকে না যে সন্তানের অকুশল সম্পাদন করেন। পৃথিবী জুড়িয়া সকলের মা সন্তানের করিবেন কুশল-সাধন আর তোমাদের মা শীতলা ভোগাইবেন বসন্তে, মা মনসা ঘটাইবেন সর্পাঘাত আর মা কালী মারিবেন ওলাউঠা দিয়া, এসব যে যুক্তিহীন আজগুবি মিথ্যা, ইহা বুঝিতে কি অধিক বুদ্ধির দরকার হয়? কতকগুলি অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক ও অর্দ্ধশিক্ষিত পুরুত ঠাকুর এসব গল্পগাছা প্রচার করিতেছে বলিয়াই কি ইহা তোমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে? মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়াই জান। ইহাতে বিচলিত হইও না।

কয়েকদিন যাবৎ আমি চোখ বুজিলেই যেন শুনিতে পাই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছেন,—"আমার জন্মভূমি।" এই মাত্র আমি দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম করিতে গিয়া ক্ষণকালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বজ্রকণ্ঠে সঙ্গীত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলাম, "আমার জন্মভূমি।" কে যেন বলিয়া দিল, ইহা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কণ্ঠস্বর। তাঁহাকে আমি দেখি নাই, কণ্ঠস্বরও শুনি নাই। কিন্তু ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠ বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল। জাগিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, কেন এই গান শুনিলাম। কিন্তু তোমাকে পত্র লিখিতে লিখিতে স্পষ্ট বুঝিতেছি, কেন শুনিলাম। যে দেশ জ্ঞানে, পুণ্যে, বীর্য্যে, আদর্শে সকল রকমে ছিল জগতের বন্দনীয়,সেই দেশে আজ কুসংস্কার করিতেছে রাজত্ব। সেই দেশে কুসংস্কার-সৃষ্টিকারীরা আজও সমান কর্ম্ম-তৎপর। সেই দেশে বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা বিসর্জ্জন দিয়া

ধর্ম্মের নামে এখনও কত অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার অনায়াসে সম্ভ্রান্ত গৃহগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত সমাদরে স্থান করিয়া লইতেছে।

তোমরা মা কুসংস্কার পরিত্যাগ কর। নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা পরমপ্রভু পরমেশ্বরকে সত্য জানিয়া তাঁর উপাসনায় রত হও। রোগের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া শীতলা, মনসা আদি ভীতির প্রতীকের পূজায় বৃথা শক্তিক্ষয় করিও না। তোমার গৃহে অখণ্ড-বিগ্রহ ওঙ্কার নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। তুমি তোমার সকল পূজা, সকল অর্চ্চনা সেখানেই কর। সেখান হইতেই ভয় হইতে ত্রাণ, বিপদ হইতে উদ্ধার, সঙ্কট হইতে মোচন, বন্ধন হইতে মুক্তি, দুর্গতি হইতে প্রতীকার যাচিয়া লও। দশ দিকে মন দিও না, নিষ্ঠাকে দুর্ব্বল করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ইন্দ্রিয়গুলিকে অঙ্গহীন বা অঙ্গচ্যুত করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম হয় না। কষিয়া লাগাম ধরিলে তাহারা সংযত হয়। অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম যত গভীর হইবে, লাগাম ধরিতে বল তত বেশী পাইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সংযমনের জন্য ভগবৎ-প্রেমের শরণাপন্ন হও। পুরুষকার ও ঈশ্বরকৃপা দুইটীকে

মিলাইয়া একটী সূতায় পাকাইয়া লও। সেই দড়ি দিয়া রথের ঘোড়ায় লাগাম কষিলে রথ আর বিপথেও যাইবে না, হঠাৎ থামিয়াও পড়িবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। লাভের লোভ যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে, তখন সে অপরের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। অথচ দেখ, মানুষ হইয়া মানুষের বিষয়ে চিন্তা না করা এক অতিশয় অপরাধজনক ব্যাপার। আমিই একা সরোবরের সমস্ত সলিল পান করিব, আর কাহাকে ছুঁইতে দিব না, ইহা অতিশয় নীচ স্বার্থপরতা। আমিই একা আকাশের সমস্ত বর্ষণ ধরিয়া রাখিব, অন্যের ক্ষেতে এক বিন্দু জল যাইতে দিব না, ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতা। তোমাদের ধর্ম্ম-প্রচারের ছায়া-যন্ত্রটীকে যেই ভদ্রলোকের সহায়তায় চালু করিবার কল্পনা করিতেছ, তিনিও নিজের টাকা-আনা-পাইকে বড় কড়া হিসাবে গুণিতেছেন। এমন বুদ্ধি লইয়া যাহারা চলে, তাহাদের সংস্রবে কাজে সফলতা দুরূহ।

তবে লোভের মুর্ত্তিমান বিগ্রহগুলিকে দেখিয়া তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করিতে যাইও না। অবনত জগতে নীচবুদ্ধি স্বার্থপরায়ণ লোকেদের দ্বারাও কোন্ কৌশলে কতটুকু লোককল্যাণকর কাজ করাইয়া লওয়া যায়, তাহার চেষ্টা অবশ্যই দেখিতে হইবে। নিজেদের মনুষ্যত্বের হানি না করিয়া, কোনও প্রকার পাপ ও দুর্নীতির সহিত আপোষ না করিয়া, মানুষের সমক্ষে অন্যায়ের কোনও দৃষ্টান্ত স্থাপন না করিয়া হীনবুদ্ধি স্বার্থসন্ধী লোকদের দ্বারা জগৎকল্যাণমূলক কাজের সহযোগ যতটা গ্রহণ করা চলে, তাহা নিবে। সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্য সবই লোভী ব্যক্তিরা পয়সার বিনিময়ে করিয়া থাকে। তোমরা পয়সা দিবার দিও কিন্তু কেবল সুনীতি-পূত সঙ্গত কাজটুকুরই জন্য তাহা করিও। পয়সা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া লোভী লোকের দ্বারা তোমরা কোনও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পাপের প্রশ্রয় দেওয়াইও না। অপরে যাহা করে করুক, পরনিন্দায় কাজ নাই, কিন্তু নিজের জায়গায় স্থির, সত্যময় ও সুন্দর থাকিও।

তোমাদের সহরটাতে জাগৃতির একটা চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। এক সঙ্গে পাঁচ শতাধিক লোকের ভিতরে অন্যত্র এইরূপ সমাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্যে পড়িলেও এমন অপকট ও জাগ্রত উদ্দীপনা বোধ হয় আর শীঘ্র দেখি নাই। মনে হইয়াছে, সত্যই লোকগুলির ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। এই পাঁচ শতাধিক লোককে দীক্ষাগৃহে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি যে, যুগপরিবর্ত্তনের হাওয়া সত্যই বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবল হুজুগে এতগুলি শিক্ষিত লোক আমার নিকটে ছুটিয়া আসিতে পারে না। বিশেষতঃ এই সহরে আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও

আসি নাই।

এই জাগৃতির দৃশ্য আমাকে এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘরে ঘরে যাইয়া এই বাণী অদ্ব্যর্থবোধক ভাষায় বলিয়া বেড়াইবার প্রেরণা দিতেছে,—“জগতে কেহ ছোট নাই, কেহ হেয় নাই, কেহ অপাংক্তেয় নাই, সকলেই একই পরমপ্রভুর সন্তান, সকলে তাঁহারই প্রতিনিধি, সকলেরই জাতি এক, বর্ণ এক, ধর্ম্ম এক, লক্ষ্য এক।” সকলকে এক আশায় বুক বাঁধিয়া অন্তরের ব্রহ্মকে জাগাইবার জন্য উদ্বোধনী গীতি গাহিতে চাহি। একটী ক্ষুদ্র পল্লীকেও বাদ দিতে ইচ্ছা করি না, একটী দরিদ্র-কুটীরকেও না। ইহাদের প্রতি জনের প্রাণে আশার স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই কর্ত্তব্যে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না।

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে বর্ত্তমানে আমার শরীরের স্বাস্থ্য লইয়া। আগে যেমন এক-নাগাড়ে তিন-চারি-পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কেবলই ভ্রমণে থাকিতাম, এখন তাহা পারি না। পথমধ্যে হঠাৎ নূতন নূতন প্রগ্রাম জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার দরুণ যে অসুবিধাগুলি হয়, তাহা ছাড়াও এমন কতগুলি কষ্টকর অবস্থা আছে, যাহার সম্পর্কে আমার এখন যথেষ্ট ক্লেশবোধ আসিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত শরীর লইয়া জিদ করিয়া নূতন নূতন শ্রমের বয়স এই শরীরটার নাই। সুতরাং এক সঙ্গে পনের দিনের বেশী ভ্রমণ আমার কোনও স্থানেই চলিবে না। এত অল্প সময়ে তোমরা এক এক অঞ্চলের সবগুলি পরিকল্পনা সফল করিতে পার না, বলিয়া হও ক্ষুব্ধ, আর দীর্ঘতর সময় প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত অনিয়ম সহ্য করা আমি মনে

করি শরীরের বিচারে দুঃসাহস। তোমরা যাও চটিয়া। আমি পারি না তোমাদিগকে খুসী করিতে। এই মুস্কিলের আসান কি করিয়া হইবে?

আর একটী মুস্কিল হইতেছে এই যে, আমাকে নিয়া তোমরা ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর এই তিন জানোয়ারের পরিশ্রম দ্বিধাহীন মনে করাইয়া লইলে এবং আমিও আনন্দ সহকারে আমার চিরাভ্যস্ত প্রিয় পরিশ্রম করিয়া গেলাম। কিন্তু ইহার আগে বা পরে তোমরা যে বাবা মোটেই পরিশ্রম কর না। যে কথা আমি পরে গিয়া কহিব, সে কথার সহিত আগে ভাগেই সকলের পরিচয় স্থাপন করাইয়া রাখা কত লাভজনক। যে কথা আমি আমার নিজস্ব ভঙ্গীতে বলিয়া আসিলাম, সেই কথাগুলি ইহার পরে বারংবার তোমাদের গিয়া বলিবার মধ্যেও অশেষ সার্থকতা। আমার আগে এবং পরে তোমরা কিছুই করিবে না। সকল কাজের জন্য আমার আগমনের প্রতীক্ষাতেই বসিয়া থাকিবে এবং আমার আগমনেই ত' সব করণীয় কাজ হইয়া গিয়াছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পরবর্ত্তী চেষ্টাগুলিও চালাইবে না, ইহা কোন্ দিক দিয়া লাভজনক এবং কতটুকু সুফলপ্রদ। একটা কাজ করিতে হইলে প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই ইহা চাহিবেন যে, কাজটার ফল স্থায়ী হউক। একই সৎকথা বারংবার না বলিলে কি এই যুগে মানুষের মনে কোনও অনভ্যস্ত বিষয় দীর্ঘকাল ঠাঁই নিয়া থাকিতে পারে? শ্রম করিব এবং তাহার সুফলের স্থায়িত্ব কামনা করিব না, ইহা ত' কোনও প্রশংসার কথা নহে। জীবনের অধিকাংশ শ্রমই আমরা বৃথা করিয়া থাকি। তাহার অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কতিপয় কারণ এই ঃ— কেন শ্রম করিতেছি, তাহা সঠিকভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি না; যাহাদের মধ্যে

কাজ করি, তাহাদের প্রকৃত প্রয়োজন জানিয়া লইতে চাহি না; যে কাজটুকু করিব বলিয়া স্থির করি, তাহার আয়োজনটুকু সহিষ্ণুতার সহিত সম্পন্ন করি না; কাজ যখন ধরি, তখন সম্ভাব্য সবগুলি অনুকূল শক্তিকে সমযোগে ইহার সহিত কাজে লাগাই না; কাজ যখন ছাড়ি, তখন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও ভাবেই ইহার পুনঃপৌনিক অনুষ্ঠান সম্ভব করিতে চাহি না; যাহাদের মধ্যে কাজ করি, তাহাদের ভিতরে কৃপাপূর্ব্বকই যাইতেছি বলিয়া মনে মনে একটা ধারণা করি এবং তাহাদের প্রতি কৃপাপ্রার্থীর ভাব আরোপ করি।

"সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে নামিতে পারিলেই কাজ ধরা উচিত", আমার ইহা আবাল্যের সংস্কার। তোমাদের সকলকে কি আমি এই সংস্কারের অংশীদার করিতে পারিয়াছি?. তোমরা তিন দিনের ছুটি নিয়া আসিয়া কাজ ধর এবং ছুটি ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছাড়। কিন্তু আমার ত' বিশ্রাম বাবা জীবনে সেই একদিন, যেদিন শরীর-মধ্যে থাকিয়াও হৃৎপিণ্ড আর কাজ করিবে না। তাই আমি তোমাদের লইয়া বড় অসুবিধায় পড়ি। তিন দিনের ছুটি নিয়া আসিয়া তোমরা দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা কাজ কর, রাত্রি জাগরণ কর, গলা ভাঙ্গ, সর্দ্দি-কাসি-জ্বরে আক্রান্ত হও, আর ছুটিহীন সমগ্র জীবন জুড়িয়া আমি দৈনিক আঠারো ঘণ্টা কাজ করি এবং অন্যায় অনিয়মগুলিকে বাদ দিয়া চলিতে চেষ্টা করি। তোমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা বোঝ না। ইহা কি কম মুস্কিল?

ক্ষেত্রবিশেষে সবেগে কাজ করিতে হয়। ক্ষেত্রান্তরে কাজ চালাইতে হয় ধীরে। যে মাটি পুকুর ভরাট করিয়া সমতল হইয়াছে, তাহাতে

দালানের ভিত গাঁথা সুরু করিতে হয় কয়েক বৎসর প্রতীক্ষার পর। অতএব সব দেশে সমান গতিতে কাজ চলিতে পারে না। কিন্তু কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া কোথাও রাখা চলিবে না।

তুমি তোমার পত্রে যে দুইটী সহরের কথা লিখিয়াছ, তাহার একটী ত' রেলওয়ে-সহর, প্রকৃত প্রস্তাবে একটী গ্রামই বটে। অন্য সহরটী গ্রামের দৃশ্যাবলীতে সমৃদ্ধ হইলেও বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধীমান্ ব্যক্তিদের সমাবেশে সংস্কৃতির একটী সজীব প্রাণকেন্দ্র। দুই স্থানে তোমাদের কর্ম্মরীতি এক হইতে পারে না কিন্তু দুইটী স্থানেই কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। তোমাদের অবসর কম একথা যেমন সত্য, তোমরা সংখ্যায় গরীয়ান, একথাও তেমন সত্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বহু লোকের অল্প অল্প সহযোগ কি জগতে অনেক অভাবনীয় ঘটনা ঘটাইতে পারে না? প্রস্তুতি-কালে সকলের অল্প অল্প শ্রমও বরণীয়, যদি তাহা যুগপৎ পাওয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তুমি কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।

তোমার মত ছোট মেয়েরাও দেশ, সমাজ ও জগতের অনেক সেবা করিতে পারে। ছোট বলিয়াই তোমরা তুচ্ছ নহ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জগতে অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছে।

কিন্তু বড় কাজের মূল হইল বড় চিন্তা। নিজের চিন্তাকে কখনও খাটো করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইলাম। বিশ্বাস করিয়া একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে তের শত টাকা একটা রাত্রির জন্য রাখিতে দিলে আর তিনি পর দিন প্রভাতেই তাহা অস্বীকার করিয়া তোমাকে পথে বসাইলেন, ইহা অদ্ভুত সংবাদ। মানুষের চরিত্র সত্যই অত নীচে নামিয়াছে, এতটা ধারণা করিতে পারি নাই। তোমার পত্র পাইয়া এইজন্য অবাক্ হইয়াছি।

বিশ্বাসভঙ্গের মত অন্যায় জগতে কিছু নাই। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে মানুষের সংজ্ঞা দেওয়াই অসঙ্গত। তবু তুমি এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করিও। নিজে বিচারের ভার না নিয়া ভগবানের হাতে বিচার ছাড়িয়া দিও। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে একদা ইহার এই প্রবঞ্চনার কুমতি

ইহাকে ছাড়িবে। তুমি টাকার জন্য শোক করিয়া পরমেশ্বরকে ভুলিও না। যিনি তোমাকে এই তের শত টাকা দিয়াছিলেন, তিনিই তোমাকে আরও বহু তেরো শত টাকা দিবেন। একজন তোমাকে ঠকাইয়াছে বলিয়াই তুমি আজ সঙ্কল্প কর যে, জগতের একটী প্রাণীও যাহাতে তোমার দ্বারা কখনও প্রবঞ্চিত না হয়, তেমন সতর্কতার সহিত তুমি চলিবে। এক ঠগ জগতে বহু লোককে ঠগ করিয়াছে কিন্তু এই প্রবঞ্চক তোমাকে করুক সৎ। তোমার সততার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে হাজার হাজার লোক সততার পথে ফিরিয়া আসুক।

সকলেই ভাবিতেছে যে, পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হইবে। কিন্তু পরকে ঠকাইয়া সত্য সত্য বড়লোক হওয়া যায় না। বাহিরে হয়ত দশজনে বড়লোক বলিয়াই ভ্রম করে কিন্তু ঠকামির স্বাভাবিক গুণেই ইহাদের সাততলা দালানে চাম্‌চিকার বাসা হয়। পরিণাম লক্ষ্য করিতে সময় লাগে বলিয়া লোকে ইহাদের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের দিনগুলি চোখের উপরে দেখিতে পায় না। কিন্তু ভগবানের বিধান বড় আশ্চর্য্য. যে যত পরপ্রবঞ্চক, তাহার জীবনে তত আশাভঙ্গ ও অকথনীয় দুঃখের পসরা চাপিয়া বসে। এই দুঃখ ভুলিবার জন্য ইহারা মদিরাসক্ত হয়। মদিরা ইহাদিগকে অধঃপথে নিয়া যায়।

তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, জগতের সকল লোকও যদি অসৎ হয়, তবু তুমি নিজে কখনও অসৎ পথে যাইবে না। আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ নাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৫শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সম্মুখে তোমার সুবিস্তৃত পথ। বীরের মতন সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া যাও। ভয়-ভীতি, সংশয়-সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব; দুর্ব্বলতা-কাতরতা, আলস্য-অবসাদ কোনও কিছুকেই প্রশ্রয় দিও না। চলিতে চলিতে পথ কমিবে, লক্ষ্য নিকটতর হইবে। না চলিয়া কেবল কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিলে পথ ফুরাইবে না। আর, এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিলেও লাভ হইবে না। থামিয়া যাওয়া আর মরিয়া যাওয়া এক কথা। যত চলিবে, ততই তুমি জীবনের অমৃতরসে হইবে অভিষিক্ত।

ভগবদারাধনার পথ আর আত্মসংযমের পথ অভিন্ন। ভগবদারাধনা করিতে করিতে আপনা-আপনি মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপরে কর্ত্তৃত্ব আসিয়া যায়। অথবা অন্য ভাষায় বলিতে হইলে, মন ও ইন্দ্রিয়নিচয় তখন ঈশ্বরেচ্ছা পূরণের জন্য অনুগত ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ে। ভগবদারাধনাকে জীবনে সত্য করিতে পারিলে চিত্ত-সংযমের জন্য আর ভাবিতে হয় না।

কামদমন করিব, ক্রোধদমন করিব, মোহদমন করিব ইত্যাদি

সৎসঙ্কল্প ত' খুব ভাল। বারংবার সঙ্কল্প করিতে করিতে দেহ-মন-প্রাণ আপনা-আপনি সেই সঙ্কল্প সাধনের অনুকূল হইতে থাকে। আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তা দেহের পরমাণু সমূহের মধ্যে রূপান্তর এবং পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। একমাত্র সচ্চিন্তার শক্তিতেই অনিত্য দেহ নিত্যত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। চিন্তা যখন সঙ্কল্পমূলক হয়, তখন তাহাতে প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও দ্রুত-গঠন-ধর্ম্মী হয়। কিন্তু সঙ্কল্পের দ্বারা দৈহিক পরমাণুসমূহের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনাদি যদ্রূপ স্থায়ী হয়, নিজেকে প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গের চেষ্টার মধ্য দিয়া জড় দেহের যে আণবিক পরিবর্ত্তনসমূহ হইতে থাকে, তাহার স্থায়িত্ব তাহা হইতে অধিকতর। সুতরাং ঈশ্বরারাধনাকে মূল করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমের সঙ্কল্পকে তাহার অনুগত রাখিয়া কাজ করিয়া গেলে তুমি অধিকতর লাভবান হইবে। যাহারা ঈশ্বর মানে না, ঈশ্বরাভিনিবেশ সম্পর্কে অন্তরে পোষণ করে দ্বিধা বা বিদ্বেষ, তাহাদের কথা পৃথক। কিন্তু তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর। জীবনের অনেক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার করুণাকণার স্পর্শ পাইয়াছ বলিয়া অনুভব কর। সুতরাং তোমার প্রয়াসে ঈশ্বরারাধনার স্থান সর্ব্বোচ্চে।

আস্তিক বা নাস্তিক, বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, নিশ্চিন্ত বা সন্দিগ্ধ, জগতের প্রত্যেকটি লোককে চিত্ত-সংযম অর্জ্জন করিতে হইবে। সুতরাং কেহ ঈশ্বর-বিশ্বাস করে না বলিয়া ঘোষণা করিতেছে দেখিয়াই তাহার অন্যরূপ সৎপ্রয়াসের প্রতি কখনও বিরূপ হইও না। মাতা-পিতাকেও ভালবাসার ভঙ্গি সকলের এক নহে। অনেক শিশু মাকে কিলাইয়া

চড়াইয়া ভালবাসা দেখায়। অনেক খ্যাতনামা নাস্তিকেরাও মনে মনে ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাস প্রকাশের ভঙ্গিটা নেতিবাচক। জগতের যেখানে যিনি যতটুকু পরকল্যাণমূলক কাজ করিয়াছেন, ইনি ততটুকুই শ্রদ্ধেয়। তিনি ঈশ্বর মানেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন হেতুতেই অন্য বিষয়ে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পার না। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণীর মানবের প্রতি, সর্ব্ব-প্রকারের জনহিতৈষী কর্ম্মীর প্রতি অন্তরের দ্বেষ-বর্জ্জিত-প্রেম-বিমিশ্র সপ্রশংস ভাব রক্ষা করা আত্ম-সংযম সাধনের পক্ষে এক মহান উপায়। পরনিন্দুকেরা যে সহজেই সংযমভ্রষ্ট হয়, একথা অনেকেই জানে না। লোকের নিন্দা যত কম করিবে, আত্মসংযমের ক্ষমতা তোমার তত বাড়িবে। লোকের গুণের প্রশংসা যত অধিক করিবে, তোমার ভিতরে প্রশংসনীয় গুণাবলীর সমাবেশ-সম্ভাবনা তত অধিক বাড়িবে। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের সদ্‌গুণের আলোচনার দ্বারা অজ্ঞাতসারে সেই সকল গুণাবলি তোমার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। অবশ্য তাই বলিয়া বাচালতা প্রকাশের জন্য প্রশংসা-ভাষণ কোন কাজের কথা নহে। মানুষের কাছে সাধু সাজিবার জন্য আমরা অনেক সাধুর প্রশংসা করি। কাজটা ভালই করি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা থাকিয়া যায় মন্দ। সকল কাজই উদ্দেশ্যের তারতম্যের জন্য ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে।

ওঙ্কার-মন্ত্রে যখন দীক্ষা পাইয়াছ, তখন কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ প্রভৃতির ধ্যান করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি ওঙ্কারই ধ্যান করিবে। কালী, দুর্গা, শিব, গণেশকে ধ্যান করিলে না বলিয়া তাঁহারা তোমার

উপর চটিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। কারণ ক্রোধ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা দেবতার স্বভাব নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত' তোমাদিগকে এইভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, অমুকের পূজা না করিলে মহামারী হইবে, তমুকের পূজা না করিলে নির্ধনতা আসিবে—ইত্যাদি। ভয়ের দ্বারা আতুর করিয়া নানা সময়ে নানা দেবতার পূজা প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও পূজা প্রেমের আকর্ষণে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সব পূজাই যখন এক পরমেশ্বরের, তখন ধ্যান করিতে বসিয়া পাঁচ রকমের ধ্যান জমাইতে গিয়া সাধিয়া সংশয়ের হট্টগোলে পড়িবে কেন? দেবতাদিগকে যদি ঈশ্বরের বিভূতি বলিয়া মান, তাহা হইলে একথা ভাবিতে কেন কষ্ট হইবে যে, তাঁহারা সকলেই ওঙ্কারের মধ্যে আছেন? দেবতাদিগকে যদি স্মরণাতীত কালের মহাপুরুষ বলিয়া মান, যাঁহারা ঈশ্বর-সাধন করিতে করিতে লোকের কাছে ঈশ্বরের সম্মান পাইয়াছেন, তাহা হইলে একথা ভাবিতেই বা কষ্ট হইবে কেন যে, তাঁহারাও ওঙ্কার-মন্ত্রে ঈশ্বরকেডাকিয়াছেন? স্বপ্নে একদিন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলে, তাহাতে ইহাই মাত্র প্রমাণ হয় যে, যেই পরিবেশের মধ্যে আবাল্য পরিপালিত হইয়া আসিয়াছ, সেই পরিবেশের ধার্ম্মিক প্রভাবটুকু তোমার উপরে আজও রহিয়াছে। স্বপ্নে তোমরা কতজন আমার মূর্ত্তি ত' দেখিয়া থাক—এমন কি যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত নহ বা আমাকে জীবনে দেখ নাই—এমন শত শত ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ। ইহা দ্বারা মাত্র এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, আমার সহিত তোমাদের একটা আপনত্বের সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, কেহই তোমাদের পর নহেন,—

স্বপ্নাদি দর্শনের প্রতিফলিত সিদ্ধান্ত মাত্র এইটুক। দীক্ষা পাইয়াছ ওঙ্কার-মন্ত্রের—ধ্যানও কর ওঙ্কারেরই। ওঙ্কারের ভিতর কখনও কৃষ্ণ ফুটিয়া উঠিতে পারেন, কখনও বা ফুটিয়া উঠিবেন কালী। কখনও যে আমার মত সামান্য মানুষই ফুটিয়া উঠিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য হইবে এই যে, ওঙ্কারই তোমার প্রামাণ্য বেদ। অপরাপর পরিদৃষ্ট রূপ কখনও তাহার টীকা, কখনও তাহার টিপ্পনি। তোমার ক্যানাডিয়ান বা আমেরিকান গুরুভ্রাতারা ওঙ্কার জপিতে জপিতে কখনও কখনও খ্রীষ্টকেও দেখিতে পান। খ্রীষ্ট এবং কৃষ্ণ যে এক, বুদ্ধ এবং গৌরাঙ্গ যে এক, শিব এবং বিষ্ণু যে এক, এই প্রতীতি একমাত্র ওঙ্কার-সাধনার মধ্য দিয়াই সহজসাধ্য। ক্লীং মন্ত্র জপ করিতে করিতে কৃষ্ণ আর খ্রীষ্টকে এক বলিয়া এখনও বোধ হয় কেহ উপলব্ধি করেন নাই। ওঙ্কার-মন্ত্র সেই উপলব্ধিকে সহজায়ত্ত করিয়াছে। বিশ্বের সকল বিভেদ যেই একটি মহামন্ত্রের মধ্যে সমন্বিত, সামঞ্জস্যীকৃত ও স্বীকৃত হইয়া সকল বিভেদ-বিচ্ছেদের মূল উৎপাটিত করিয়াছে, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর সেই মন্ত্ররাজের ধ্যানই ত তোমাদের পক্ষে প্রশস্য।

নাম নিত্য সত্য পরমবস্তু। ইহা কোনও অবস্থাতেই অসত্য হয় না। নাম অশুদ্ধ বস্তুর শুদ্ধিসম্পাদন করে। সুতরাং যে কোনও অবস্থায় নাম জপ করিতে পার। আমি মলমূত্র-ত্যাগ-কালেও নামজপ করিয়া থাকি। ইহাতে নামের কোনও মহিমাচ্যুতি ঘটে না। তবে সেই অবস্থাতেও নামের প্রতি মনের শ্রদ্ধা চাই। যে সকল আচরণকালে শরীর অপবিত্র হয় বলিয়া সংস্কার আছে, সেই সময়েও অবিচ্ছেদ

নামজপ চলিতে পারে, যদি তখন নামের প্রতি হেলা-খেলার ভাব না থাকিয়া থাকে শ্রদ্ধা, আস্থা, অনুরাগ। কিন্তু এ কথা দ্বারা ইহা বুঝিও না যে, অন্যান্য নামজপ করিতে শরীরের শৌচাশৌচ-বিচারের প্রয়োজন নাই। উপাসনায় বসিবার আগে সুধৌত সুপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিলে মন আপনি পবিত্র হয়। উপাসনার স্থানটীকে পরিচ্ছন্ন পরিষ্কৃত করিলে তাহারাও সুপ্রভাব মনের উপর পড়ে। জায়গাটায় একটু জলের ছিটা দিয়া নিলে সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর একটা প্রভাব পড়ে। সুতরাং এই সুযোগটুকু কেন গ্রহণ করিবে না? উপাসনার আগে স্নান করিয়া নিলে আপনা আপনি মন অন্তর্ম্মুখ হয়। অস্নাত অবস্থায় উপাসনায় বসিলে মন যত সময়ে একাগ্র হইবে, স্নানটুকু করিয়া বসিলে তাহার সিকি সময়ে মন একমুখ হইয়া যায়। সুতরাং এই সুযোগটুকু কেন গ্রহণ করিবে না? বহিঃশৌচ দ্বারা অন্তঃশৌচের সহায়তা হয়। সুতরাং যখন যখন শুচিভাবে সম্ভব, তখন তখন শুচিভাবেই নামজপ করিবে। যখন তাহা সম্ভব হইবে না, তখন শৌচাশৌচ-বিচার না করিয়া নাম করিয়া যাইবে। ক্ষুধা পাইলে মানুষ হাত ধুইয়া খাবার খায়। কিন্তু পথে ঘাটে হাত ধুইবার জল না পাইয়া আঙ্গুলের ডগা দিয়া ধরিয়া কেহ কেহ কি রসগোল্লা গলাধঃকরণ করে না? ইহাও তদ্রূপ জানিও।

মোট কথা, সাধন করিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৫শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি একখানা তিন নয়া পয়সার পোষ্ট-কার্ড দ্বারা আমার সমাজ-কল্যাণ কাজের সহায়তা করিয়াছ। এই তিন নয়া পয়সাকে আমি তুচ্ছ জিনিষ বলিয়া মনে করি না। মহৎ এবং বৃহৎ কাজ করিতে গেলে বহু সদাত্মার সহযোগ আবশ্যক হয়। সেই সহযোগ যে বিরাট বিরাট আকারেই পাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। এক লক্ষ লোক যদি একটি করিয়া মাটির ঢেলা দিয়া সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার ফলে হাজার বছরের ডোবা জমি একদিনে উত্থিত হইতে পারে। ক্ষুদ্রকে দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও সে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। বহু ক্ষুদ্র সম্মিলিত হইলে অতি বৃহৎ হইতে পারে। প্রয়োজন হইতেছে সকলের যুগপৎ সম্মিলিত হওয়া। ক্ষুদ্রেরা এক সঙ্গে মিলিবার অভ্যাস করুক না, তাহাদিগকে তুচ্ছ করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না।

এক সঙ্গে মিলিবার অভ্যাসটা তোমরা কর। ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের অনেকেরই সদিচ্ছা আছে। কিন্তু সকলের কর্ম্মপ্রচেষ্টা একসঙ্গে বমিলিত হয় না। ফলে, ঐক্যলব্ধ-শক্তি তোমাদের পক্ষে কার্য্যকর হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

২৫শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার বিবাহ-সংবাদে আনন্দিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের দাম্পত্য-জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় তৃপ্তিময় এবং জগন্মঙ্গলময় হউক। তোমাদের জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যেন জগতের জন্য অর্ঘ্যস্বরূপ দিতে পারে কুশলের অবদান।

যাহাকে পূর্ব্বে কখনো দেখ নাই, আজ সহসা তাহাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীরূপে পাইবে। কত অনিশ্চিত চিন্তা আজ তোমার মনে উঠিতেছে। কিন্তু মনে রাখিও, ভারতের বিবাহিত জীবন অতি উচ্চ গ্রামের আধ্যাত্মিক জীবন বলিয়া শিব-পার্ব্বতীকে বিবাহিত কল্পনা করিয়া যুগলে বন্দনা করা হইয়া থাকে। তোমার আর তোমার স্বামীর জীবন যেন লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবনের মর্য্যাদা পায়।

চিন্তার স্বচ্ছতা আসিলে দেহের স্বভাব বদল হইয়া যায়। চিন্তার পবিত্রতার সঙ্গে দেহের স্বচ্ছতা আসে। তখন দাম্পত্য-জীবনে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা মোটেই কঠিন হয় না।

বড় বড় গৃহী মহাপুরুষদের জীবনে যাহা সত্য হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়া থাক, তোমার এবং তোমার স্বামীর জীবনেও যে তাহা সত্য হইতে পারে, এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিও। বিশ্বাস খুব বড় জিনিষ। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা যাহা হইয়া বা করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বাসের বল থাকিলে আর সেই বিশ্বাসের অনুযায়ী ভাবে নিজেকে

অবিরাম অবিশ্রাম পরিচালিত করিতে থাকিলে সাধারণ মানুষও ক্রমশঃ তাহা হইতে বা করিতে পারে। তোমরা সাধারণ মানুষ থাকিয়াই অসাধারণত্ব অর্জ্জন কর, এই আশীর্ব্বাদ আমি করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

২৬শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস জানিও। তোমাদের কুশল সংবাদ জানিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই ব্যগ্র। একটার পর একটা করিয়া বিপদ গত কয়েকটা বৎসর ধরিয়াই তোমাদের উপর দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাস রাখিও, বিপদ যিনি দিয়াছেন, বিপৎত্রাণও তিনিই করিয়া যাইতেছেন। সঙ্কটের মুখে পড়িয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখা গেলেও তাঁহারই করুণার আলো ঐ সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে এবং সঙ্কট-মোচন করিতেছে। সাম্প্রতিক বিপৎপাতে হতবুদ্ধি হইও না।

শিষ্যের মনে যদি গভীর ভক্তি থাকে, তাহা হইলে গুরুদর্শনের দ্বারাও সে অশেষ অকল্যাণ হইতে উদ্ধার পায়,—এই যে একটা কথা গুরুদেবদের মুখে অনেক সময়ে শুনা যায়, এই কথাটা গুরুদেবেরা

সকল সময়েই যে নিজেদের পসার বাড়াইবার জন্য বলিয়া থাকেন, তাহা নহে। এই কথার মধ্যে একটা সুগভীর সত্যও রহিয়াছে। আমি ত' বাবা গণতন্ত্রের যুগের গুরু, যেই যুগে গুরু নিজেকে শিষ্যের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সমান ভাবিয়া চলিবেন কিন্তু তথাপি আমি ইহা অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করি যে, গুরুতে শিষ্যের অনুরাগ যখন অকপট, ঐকান্তিক ও সুদৃঢ়, তখন একমাত্র গুরুদর্শনের দ্বারা শিষ্য প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারে। প্রচলিত গুরুবাদের সহিত নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত সৈনিকরূপে আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, শিষ্য যেখানে একান্ত অনুরাগী এবং গুরু যেখানে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ, সেখানে গুরু-শিষ্য পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করিয়া সর্ব্বতোভাবে লাভবান হন। গুরুদর্শনে যেমন শিষ্যের লাভ, শিষ্য-দর্শনেও গুরুর তেমন লাভ।

আমি ত' তোমাদের প্রতিজনকে আমার ধ্যানের দেবতা, ভজনের বিগ্রহ বা আরাধ্যের প্রতিচিত্র রূপে হৃদয়ে স্থান দিয়া রাখিয়াছি। লৌকিক প্রয়োজনে তোমাদের অসংখ্য জনের ভক্তিপ্রণাম গ্রহণ করতঃ নিয়ত আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতে নিরত থাকিয়াও তোমাদের প্রতি প্রত্যেকটী ব্যবহারের মধ্য দিয়া আমি তোমাদের পূজা করিতেছি। ভাগ্যবান্ কেহ কেহ আমার সেই পূজাভাবকে উপলব্ধি করিয়া উহার সহায়তাতে আত্মোন্নতির শীর্ষ-স্থানে উঠিবার চেষ্টাও করিতেছে। অপরেরা লোকদৃষ্টিতে আমার ও নিজেদের বিচার করিয়া করিয়া

প্রকাশ্যে কেবল নিজেদের চতুষ্পার্শ্বস্থ দুই চারি গণ্ডা তদ্রূপ অনুজনেরই করতালি সংগ্রহ করিতেছে, যাহারা পরোক্ষে নিজ নিজ প্রশংসাগুঞ্জন প্রত্যাহার করিয়া লইয়া বিপরীত আচরণে প্রমত্ত হইতেছে! লৌকিক বিচারে অলৌকিকের আস্বাদন কি করিয়া হইবে? আমার দৃষ্টিতে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকার লৌকিকতার উর্দ্ধে

তোমরা যদি সাধন কর, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিবে। তাই আমি এই তত্ত্ব নিয়া কখনও কোনও উপদেশ দেই নাই। সাধন কর বাবা, সাধন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৬শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে। পত্রে তোমার কুণ্ঠা ও দ্বিধার পরিমাণ দেখিয়া হাসিলাম। জগতের সকলের সম্পর্কেই গঠন-মূলক সমালোচনা চলিতে পারে। আমার সম্পর্কেও আমি সমালোচনা সঙ্গত মনে করি। যিনি সমালোচক, তাঁহার অন্তরের উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তাহা হইলে অতর্কিতে দুই একটা কড়া কথা বাহির হইয়া গেলেও তাহা ক্ষমার্হ। অবশ্য, সমালোচনার ক্ষেত্রে

অনাবশ্যক কড়া কথা বলার কোনও সার্থকতা নাই। অকারণ রূঢ়তা সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে।

তুমি দুই একটা বিষয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করিয়াছ। তাহা হইতে যেইটুকু ভাল, তাহা আমি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। একরাশি ছাই হইতে এককণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায় কিনা, ঘাটিয়া ঘুটিয়া তাহা দেখা আমার কর্ত্তব্য। সমালোচনা খুবই আদরণীয় জিনিষ। সমালোচককে আমি বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি।

তোমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার পরে তোমার নিজের সমালোচনার আলোকেই তোমার অঞ্চলে কাজ সুরু করিয়া এবং সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিও যে, তোমার দৃষ্টিকোণ নির্ভুল কিনা। আমার যতদূর মনে হয়, তোমার ফিরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তোমার সহকর্ম্মীরা তোমার অপেক্ষায় হয়ত বসিয়া থাকিবে।

পাহাড়ী জনগণের মধ্যে যাঁহাদের সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছিল এবং যাঁহাদের ঠিকানা তুমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ, যদি ডাকযোগে তাঁহাদের অঞ্চলে পত্র বিলির ব্যবস্থা চালু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি জনের নিকটে তোমার কিছুদিন পরে পরে পত্রাদি লিখিয়া প্রীতিরক্ষার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি নিজে যখন সশরীরে ইহাদের মধ্যে যাইতে পারিতেছ না, তখন তোমার প্রতিনিধি রূপে তোমার পত্রগুলি যাইতে থাকিলে তাহা দ্বারাও একটা অনুকল্প চলিবে। খাশিয়া ও জোয়াইদের মধ্যে যাইবে যাইবে করিয়া

ত পঁয়তারাই হইল। অমুক প্রভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দিয়াও তোমাদিগের সাংস্কৃতিক অভিযানে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকর পৃষ্ঠপোষকতা দিলেন না, অথবা আয়োজন করিতে করিতে দারুণ শীত আসিয়া পড়িল, এইসব ওজুহাতেই ত' সব কাজ থামিয়া রহিল। এমতাবস্থায় আপাততঃ ইহাই স্থির করিয়া লও যে, দুর্গম অঞ্চলে সহরের কর্ম্মীদের যাওয়া উচিত হইয়া উঠিবে না। সুতরাং পত্র ও পত্রিকার দ্বারা যাহা করিতে পার, তাহা হইতেও কেন ক্ষান্ত রহিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৬শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস জানিও। তোমার পত্রে তোমার আংশিক বিপত্তিমোচনের সংবাদ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে, এই বিশ্বাসে ভর করিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে নির্ভয়ে সাঁতার কাটিয়া যাও। একদিন পারে পৌছিবেই। মিথ্যার আপাত-জয়ে বিহবল হইয়া পড়িয়াছিলে, এখন তোমার বিশ্বাস আসিতেছে যে, সত্যও জয়ী হয়। তুমি সত্যের উপরে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া চল। কাহারও উপরে কণামাত্র হিংসা-বিদ্বেষ না রাখিয়া তোমার প্রতি পরমশত্রুতাচরণকারীরও দিকে ক্ষমা-

সুন্দর চক্ষে প্রেমস্নিগ্ধ নয়নে তাকাও। তোমার প্রেমের বল তাহাদের বিদ্বেষের শক্তিকে পরাহত করুক।

ক্ষণিকের স্বার্থকে মানুষ বড় করিয়া দেখে বলিয়াই বিনা কারণে বা তুচ্ছ প্রয়োজনে অপরের অনিষ্ট সাধন করে। এই সকল লোকদের জন্য ভগবানের চরণে কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর। তাহারা তাহাদের নিজেদের মঙ্গল জানে না বলিয়াই অমঙ্গলের পথেই দিবারাত্রি চলিতেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তাহারা আজ যতই নীচাশয় বা পাপিষ্ঠ হইয়া থাকুক না কেন, তাহারা যেন ভগবানেরই দয়ায় স্বার্থপরতামুক্ত হইয়া জগজ্জনের কল্যাণের জন্য নিজেদের তৈরী করিতে অগ্রসর হয়। সকলে যখন সকলের জন্য ভাবিবে ও করিবে, তখন এই ধূলায় ধূসর অসুন্দর ধরণী দিব্য প্রেমের অমৃতভাণ্ডারে পরিণত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৭শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার পূর্ব্বতন সহকর্ম্মী এতদিন পরে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আশ্রমের মধ্য দিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সম্মত হইয়াছে,

এই সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম। আমি চাহি, তোমরা দুই জনে পরস্পরের সম্মাননা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়া চলিতে সমর্থ হও। পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রমে ইচ্ছা করিলেই কর্ম্মী বা টাকা পাঠাইতে পারি না। বাহিরের কোনও উৎপাত আসিয়া তোমাদের অশান্তি সৃষ্টি করিলে তাহার কোনও প্রতীকার করিতে পারি না। যথেষ্ট কষ্ট ও কৃচ্ছ্র স্বীকার করিয়াই আশ্রমে বাস করিতেছ। সৈনিকের উৎপাত, প্রতিবেশীদের অত্যাচার এবং আশ্রমের ভূমির উপরে লুব্ধ-দৃষ্টি, তোমার স্বধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা সৃষ্ট লাঞ্ছনা,—এই সকলের ভিতর দিয়া চলিতেছে তোমার দিন। তার উপরে তোমার সহকর্ম্মীর আচরণ তোমার না অশান্তি করে, তোমার আচরণ তাহার না উদ্বেগ বাড়ায় এবং একের সংসর্গ অপরের মনে অসাত্ত্বিক বৃত্তির না করে উন্মেষ, একের অনাদর্শপ্রিয়তা অপরকে না করে উচ্ছৃঙ্খল, একের প্রেম যেন অপরকে সহস্র বিপদে করে রক্ষা,—ইহাই আমি চাহি।

তোমরা দুজনে একত্রই ত' আশ্রমটাতে ছিলে। কি কারণে এক জন অপর জনের প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিয়াছিলে, কি কারণে একজন পড়িয়া পড়িয়া গ্রামের লোকের মার খাইয়াছ আর একজন গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করিয়া অশান্তিজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছ, কেন একজন অপরকে সহ্য করিতেছিলে না, কেন একজন অপর জনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সরিয়া থাকিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়াছিলে, সবই এই সময়ে একবার স্মরণ করা দরকার। তোমাদের নিজ নিজ ত্রুটী আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়া একবার হিসাব নেওয়া দরকার যে, কে জগতের সকলের জানিবার আগে আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের দোষ অতি দ্রুত সংশোধন

করিয়া নিবে। দুইটী নির্দ্দোষ মানুষ একত্র বাস করিলেও যদি অশান্তি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা নিতান্ত বোকা। সাধারণতঃ নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, ক্ষমাশীল ও সংযমী লোকদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ হইতে পারে না। সুতরাং নিজ নিজ দোষগুলি সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ চরিত্রে ঐ কয়টী সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটাইতে যত্নবান্ হও। একজনকে গোপন করিয়া অপরে কোনও কাজই করিও না। একজনের আচরণে অপর জনের মনে যেন এই সংশয় না জাগে যে, "সে ত' নিজের স্বার্থের ফিকিরে আছে।"

আশ্রমটীর অনেক ধানজমি রহিয়াছে। তোমাদের মত দুই চারিটী প্রাণীর যাবতীয় ব্যয় ইহা দ্বারা ভালভাবে সঙ্কুলান হইয়া যাওয়া উচিত। বরঞ্চ বৃহত্তর প্রয়োজনে প্রতি বৎসর কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয়ও কঠিন কথা নহে। এমতাবস্থায় তোমরা তোমাদের আবশ্যকীয় শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে যদি নিয়মিত উপাসনার প্রয়াসটীকে পঙ্গু হইতে না দাও, তাহা হইলে তাহা তোমাদের চরিত্রের যাবতীয় ত্রুটিগুলি সংশোধনে অশেষ সাহায্য করিবে। উপাসনার ফলে মনে যে প্রশান্তি আসে, তাহা কোন্ কল্যাণ না সাধিতে পারে? যাহা অভাবনীয়, যাহা অসম্ভব, যাহা হিসাব-নিকাশের বাহিরে, এমন অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন তোমাদের চরিত্রে সহজেই আসিয়া যাইবে, যদি তোমরা প্রত্যহ নিয়মিত নিজ নিজ ব্যক্তিগত উপাসনাটীতে মজবুর হইয়া চলিতে পার। সকল কাজকে অংশতঃ গৌণ বিবেচনা করিয়া উপাসনা-কর্ম্মটীকে পূর্ণতঃ মুখ্য গণিয়া লও। তোমাদের আশ্রমে ত আর ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সময় নষ্ট করিবার নিয়ম নাই। তোমরা অযাচক। বিশেষতঃ

ঐ আশ্রমটীতে আমি তোমাদের জন্য প্রচুর ধানের জমি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। সারা বৎসর সামান্য সামান্য সময় নিয়মিত খাটিলে তোমাদের অন্নের চিন্তা করিবার কোনও কারণই থাকে না। এমতাবস্থায় তোমরা প্রত্যহ চারিবার ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবদুপাসনায় ইচ্ছা করিলেই বসিতে পার। পুপুন্‌কী আশ্রমের মতন বিচিত্র রকমের শ্রম তোমাদের ওখানে নাই। অধিকাংশ জমি ভাগী বরগা দিয়াই ত' এতগুলি বছর তোমরা চালাইয়া আসিতেছ মনে হয়। সামান্য তরিতরকারী ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য যে শ্রমটুকু দরকার, তাহা প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও করা যাইতে পারে। অন্ততঃ তার জন্য তোমাদের চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

প্রাত্যহিক এই উপাসনা নিয়মিত করিয়া যাইতে থাকিলে তোমাদের ভজন-নিষ্ঠার প্রতি মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

এদেশের লোক অমনিই কর্ম্মযোগ বোঝে না। তাহার উপরে আশ্রমে আবার তোমরা একজনের স্থানে দুই তিন জন একত্র হইলে পরস্পরের মধ্যে আত্মকলহ করিয়া এমন বিশ্রী একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ফেল যে, তাহার দরুণ চতুর্দ্দিকের জন-সাধারণের শ্রদ্ধার ভাব আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কেহ তোমাদের কাহারও প্রতি যতই শত্রুতা-ভাবাপন্ন হইয়া থাকুক না, যদি দেখিতে পায় যে, সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও তোমরা গভীর অভিনিবেশ ও অনুরাগ সহকারে অশেষ নিষ্ঠায় তোমাদের দৈনন্দিন উপাসনা চারিবার করিয়া চালাইয়া যাইতেছ, তাহা হইলে তোমাদের ঈশ্বর-নিষ্ঠার এই দৃষ্টান্ত ইহাদের মনে শ্রদ্ধার রেখাপাত করিবে। ইহা দ্বারা ইহারাও লাভবান্ হইবে।

এই জন্যও বলিতেছি যে, হাট-বাজার, গ্রাম্য বৈঠক, সঙ্কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ ইত্যাদি যেই প্রয়োজনেই যখন আসিয়া পড়ুক, তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের প্রাত্যহিক উপাসনাটী কঠোর নিয়মে করিয়া যাইতে চেষ্টা করিও। যেই বেলা সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনা হইতেছে, সেই বেলা আলাদা ব্যক্তিগত উপাসনার প্রয়োজন নাই।

আর একটী বিষয়ে বিশেষ ভাবে না বলিয়া পারিতেছি না। আশ্রমের ব্রহ্মচারী কর্ম্মী হইয়া যাহার বাস করে, তাহাদের একদিকে যেমন যদৃচ্ছা ভোজন পরিহার করিতে হয়, অপর দিকে তেমন স্ত্রীলোকদের সহিত অকারণ ঘনিষ্ঠতাবর্জ্জন করিতে হয়। গ্রামে গ্রামে কত সরলা রমণী রহিয়াছে, যাহারা এই সহজ সরল কথাটা বোঝে না বা জানে না যে, একজন আশ্রমী ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়া এমনভাবে চলা উচিত নহে, যাহা দেখিলে পাপমনা ব্যক্তিরা বিনা দোষে মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায়। তোমাদের শয্যায় বা তোমাদের সহিত একাসনে কোনও স্ত্রীলোককে কখনও বসিতে দিও না। সূর্য্যাস্তের পরে কোনও স্ত্রীলোককে একাকিনী আশ্রমে আসিতে বা থাকিতে দিও না। তোমার শৌচকালে, স্নানকালে, বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তন কালে বা শরীর-মর্দ্দনাদি কার্য্য করিবার কালে কোনও স্ত্রীলোককে কাছে থাকিতে দিও না। সোহাগ করিয়া তোমার মুখে খাবার তুলিয়া দিয়া তোমাকে আদর করিবার অধিকার কোনও স্ত্রীলোককে দিও না। কোনও স্ত্রীলোক তোমার নিকট তাহার গুপ্ত জীবনের কোনও কাহিনী বর্ণনা করিতে চাহিলে তাহা কখনও শুনিও না। তোমার শয্যা প্রস্তুত করিবার বা স্নানের কাপড় ধুইবারে ভার কখনও কোনও স্ত্রীলোকের উপরে রাখিও

না। উৎসবাদি ব্যাপার ছাড়া অন্য সময়ে কোনও স্ত্রীলোককে তোমাদের রান্নাঘরেও প্রবেশ করিতে দিও না। কোনও স্ত্রীলোক একাকিনী উপাসনা-গৃহে উপাসনায় নিরতা থাকিলে তখন উপাসনা-মন্দিরের বাহিরে থাকিও।

আশ্রমের ভিতরে যেমন এই সকল বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিবে, গ্রামে যাইয়াও তদ্রূপ চলিতে হইবে। খপ্ করিয়া একটী মেয়ের হাত ধরিয়া কথা বলিতে সুরু করা, ধপ্ করিয়া গিয়া একটী মেয়ের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া গল্প করিতে সুরু করা, মেয়েরা যেখানে শৌচ, পান ও আহার করিতেছে, যেই খানে গিয়া হাজির হওয়া, মেয়েদের নিকটে উপদেশ-দান-চ্ছলে নিজের জীবনের কোনও গুপ্ত কথা বলিবার চেষ্টা করা, সেই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রসঙ্গ পুরুষদের সঙ্গে করা চলে তাহা নিয়া মেয়েদের কাছে হাজির হওয়া, বাছিয়া বাছিয়া মেয়েদেরই আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ান এবং হাসিঠাট্টার নাম করিয়া তাহাদের সঙ্গে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির চেষ্টা করা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ চপলতা তোমাদের বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। তোমরা মনে মনে খাঁটি আছ, এই যুক্তি দেখাইলেই চলিবে না। তোমাদের মন ত' খাঁটি রাখিতেই হইবে, উপরন্তু তোমাদের আচরণ এমন হওয়া চাই, যেন দুষ্ট লোকেরাও মিথ্যা করিয়া কোনও কুকথা বা অপবাদ সৃষ্টি করিতে না পারে।

তুমি বলিতে পার, অপবাদ ত' অপবাদই। যাহা মিথ্যা, তাহার জন্য অত ভয় কিসের? সত্যই, মিথ্যাকে ভয় করিয়া লাভ নাই। কিন্তু অন্য বিষয়ের অপবাদের সহিত প্রণয়-ঘটিত অপবাদের ঢের

তফাৎ। কেহ তোমাকে চোর বা ডাকাত বলিলেই তোমার চুরি বা ডাকাতিতে রুচি আসিবার কোনও কারণ ঘটিয়া যায় না। কিন্তু একটী মেয়েকে অবলম্বন করিয়া তোমার চরিত্র বা অন্তরের অভিপ্রায় সম্পর্কে মিথ্যা কুকথা রটনা চলিতে থাকিলে ঐ সকল অপবাদই তোমার বা সেই স্ত্রীলোকটীর কাণে পৌঁছিয়া পৌঁছিয়া আস্তে আস্তে নিজেদের অজ্ঞাতসারে মনের ভিতরে নানা প্রকারের বাসনার সৃষ্টি ঘটাইতে থাকে। এই কারণে সাধু ব্যক্তিরা সেই স্থান যত দ্রুত পারেন পরিত্যাগ করেন, যে স্থানে প্রণয়-ঘটিত কোনও অপবাদের আশঙ্কা আছে।

অনেক দুষ্টা স্ত্রীলোক নিজের কদর্য্য অভিলাষ পূরণের জন্য সুকৌশলে অন্যের দ্বারা অপবাদ সৃষ্টি করাইয়া লয়। অনেক দুষ্ট পুরুষও কোনও স্ত্রী-বিশেষকে নিজ কব্জার ভিতর আনিবার জন্য সুকৌশলে নিজের নামের সহিত ঐ রমণীর নামে অপবাদ রটাইয়া দেয়। ইহারা বাহিরে ভান করে, যেন এই সব অপবাদের কিছুই জানে না। তৎপরে দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে দুই জনই আফশোষ করিয়া মনের বেদনা জানায় যে, দেখ, মানুষ কি দুর্ব্বৃত্ত যে মিথ্যা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া একটা কদর্য্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃত অপবাদ-প্রচারকারী এই সুযোগে বাহ্য সহানুভূতি দেখাইয়া অপরের মনকে আকৃষ্ট করে এবং সুযোগমত তাহার ঘাড় মটকাইয়া তাজা রক্ত পান করে।

এইরূপ ঘটনা জগতে অহরহ হইতেছে। এই কারণেই আশ্রমের ব্রহ্মচারী রূপে তোমাদের বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন আছে। অপবাদকে জন্মিতেই দেওয়া হইবে না, এই শুনিয়া রাখ।

চোর-ডাকাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অশ্রমের ধন বা ধান্য রক্ষার স্থানটী সম্পর্কে মন্ত্রগুপ্তি ভাল কিন্তু টাকাকড়ি আদি ব্যাপারে এক সহকর্ম্মী যেন কখনও অপর সহকর্ম্মীকে সন্দেহ করিতে না বাধ্য হয় যে, কোথায় কি জানি একটা স্বার্থের খেলা চলিয়াছে। আমি ত' আশ্রমের কর্ম্মীদিগকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আমি জীবনে একটী কর্ম্মীরও আর্থিক ব্যবহারকে কখনও সন্দেহ করি নাই বা কোনও প্রশ্নের বিষয়ীভূত করি নাই। কিন্তু হঠাৎ এক ঘটনায় প্রকাশ পাইয়া গেল যে, কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী বারো বৎসর ধরিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে আশ্রমের ধান-চাউল দিয়া ব্যবসায় করিয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয় সম্পর্কে সকলকে অন্ধকারে রাখিয়াছে। যেদিন এই ব্যাপার অবিষ্কার হইয়া গেল, সেদিন সকলের মনের অবস্থাটী কি হইল, ভাবিয়া দেখ। একটী লোক দীর্ঘকাল বহু জনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আসনে বসিয়া থাকিবার পরে যদি এইরূপ কোনও গোপন সংবাদ বাহিরে প্রচারিত এবং প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার স্থান কোথায় হয়? মানুষের জীবনে এমন দুর্ম্মতি বা দুর্গতি যেন কখনও না হয়।

মনকে সর্ব্বদা নামে লাগাইয়া রাখিবে। যখনই যে কাজে হাত দাও, মন হইতে ভগবানের পরমমধুর নামকে দূরে থাকিতে দিও না। প্রতিক্ষণ যেন মনের কাণে নামের ঝঙ্কার বাজিতে থাকে। এই প্রশ্ন অহরহই হয় যে, মলমুত্র ত্যাগের সময়েও নাম করা চলে কিনা। আমার জবাব হইতেছে,—চলে। শুধু "চলে" বলিয়াই ক্ষান্ত হইব না, "ঐ সময়েও নাম করিতে থাকা কর্ত্তব্য" বলিব। শরীরকে যখন

যে কাজেই নিয়োজিত রাখ, তারই সঙ্গে সঙ্গে নামকে মনে মনে সেবা করিতে থাকিবে। কমলা লেবুর কোয়া চুষিবার সময়ে ঐ চোষণ-ক্রিয়ার মধ্যেও নামের অনুশীলন করিবে, চিড়ার মোয়া চিবাইবার কালেও দন্তের প্রতিটি সঞ্চালনে নাম ভুলিবে না। কেহ হয়ত বলিবে যে, ঐ সময়ে মন যদি নামেই রাখি, তাহা হইলে কমলা লেবু বা চিড়ার মোয়ার স্বাদ পাইব কি করিয়া? তাহার জবাব এই যে, কমলালেবু বা চিড়ার মোয়ার স্বাদের ভিতরেও নামেরই স্বাদ পাইবার জন্যই ত' নামের সাধনা।

যেখানে সেখানে যে-কোনও অবস্থায় নাম করাটা নামাপরাধ বলিয়া কথিত হয়। যাহাতে নাম করিতে বসিলে সহজে মন নামে ডোবে, তাহারই জন্য বলা হইয়াছে যে, শুচিশুদ্ধদেহে, ধৌত পরিষ্কৃত বস্ত্রে পবিত্র স্থানে নামজপ করিবে। শুচিতার এই সকল নিয়ম অনুসরণ করিলে মন সহজে একাগ্রও হয়। নির্দ্দিষ্ট উপাসনার সময়ে এই সকল বিধি পালনের চেষ্টা যতটা সম্ভব, করিবে। যখন নিতান্ত অপারগ হইবে, তখন মনে মনে স্নান, মনে মনে বস্ত্রপরিবর্ত্তনাদি করিয়া অন্তরে শুচিতার সংস্কার সৃষ্টি করিয়া লইবে। কিন্তু অন্যান্য সময়ে কি করিবে? শরীর নানা স্থানে যাইতেছে, নানা স্থানে কাজ করিতেছে বলিয়া কি নামের সেবা হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবে? নিশ্চয়ই না। যতক্ষণ নামের প্রতি অন্তরের ভক্তি ও অনুরাগ আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, শরীর কোন্ কাজে কখন নিয়োজিত আছে, তার দিকে না তাকাইয়াই নাম-স্মরণ করিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্ব-কর্ম্মের মধ্য দিয়াই মনের মধ্যে নামের একটা নেশা জাগাইয়া রাখিতে হইবে। বস্তুত, প্রাত্যহিক চারিবার

উপাসনার উদ্দেশ্যও ত' এই যে, ইহার ফলে সারাদিন ধরিয়াই নামের নেশা তোমাকে ঘিরিয়া থাকিবে। দৈনন্দিন উপাসনায় বসিয়া যদি মনে না নেশার রং ধরিল, তাহা হইলে আর উপাসনা হইল কি?

নামজপে অপরাধ হয় কখন? যখন তুমি জঘন্য উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য নাম করিতেছ। কাহারও অনিষ্ট সাধন, কাহারও উপরে অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ, কাহারও প্রতিপত্তি-নাশের চেষ্টা প্রভৃতি হীন কার্য্যের সহিত যখন নাম জপের উদ্দেশ্যগত সংশ্রব থাকিবে, তখন নামজপে অপরাধ হয়।

অতি হীন কার্য্য করিবার কালে নামজপ করিতে থাকিলে তাহার দ্বিবিধ ফল হইতে পারে। নামজপ-সহকৃত হীন কার্য্য অনুশীলনের ফলে আস্তে আস্তে কার্য্য পাপ-ভাব-বিবর্জ্জিত হইতে পারে। আবার নাম-জপকে হীনকার্য্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া করিতে থাকার দরুণ অসতর্ক সাধকের অন্তরের শ্রদ্ধা নামসেবা হইতে স্খলিত হইয়া নামকে বীর্য্যহীন, রসহীন, দিব্যভাবহীন সাধারণ অক্ষরে মাত্র পরিণত করিতে পারে। শেষোক্ত অবস্থায় সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই, স্ত্রীলোক-ঘটিত সাধনকারীদের মধ্যে অনেককে উচ্চ অবস্থা হইতে পতিত হইয়া পাপের পঙ্কতলে গড়াগড়ি দিতে দেখা গিয়াছে। তোমরা আশ্রমীয় ব্রহ্মচারী। স্ত্রীলোক-সংশ্লিষ্ট কোনও বাহ্য ব্যবহার বা গুপ্তাচার তোমাদের নাই। কিন্তু ধর্ম্মের নামে দেশটা জুড়িয়া নানা স্থানে নানা গুপ্তাচার চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের সম্পর্কে নানা গুঞ্জন তোমাদের কাণেও আসিয়া পৌছায়। এই জন্যই আমি এই সাবধান-

বাণী তোমাদের শুনাইলাম। নতুবা এই কথাগুলির আবশ্যকতা অন্ততঃ এই পত্রে কিছুই ছিল না।

তোমরা নিয়মিত দৈনিক উপাসনাদি সারিয়া অন্য সময়ে সকল কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকেই যতটা পার নাম-স্মরণ করিয়া যাইবে। প্রীতি সহকারে নাম করিতে থাকিবে। সাধারণতঃ নিরুপদ্রব স্বাভাবিক শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিবে। কোনও সাময়িক কারণে শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকিলে ছোট্ট একটী মেরুহীন মালা দিয়া জপিবে। এই মালা তুলসী বা রুদ্রাক্ষের হইতে পারে। বৈষ্ণব বা শাক্ত কাহারও প্রথার উপরেই আমাদের শ্রদ্ধার অল্পতা নাই।

তবে মালা প্রকাশ্যে জপার মধ্যে একটী মারাত্মক বিপদও আছে। মালা তোমাকে লোকের সামনে সাধু বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিবে। তাহার ফলে গোঁসাইগিরির ভাব আসিয়া গেলে একেবারে জীয়ন্তে সমাধি হইয়া গেল। নামজপের ফল যখন দাঁড়াইবে অহঙ্কার-বৃদ্ধি, তখন ত' আর কোনও উপায় রহিল না। অপরে তোমাকে বধ করিবার আগেই তোমার অহঙ্কার তোমাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাই অহঙ্কার-বর্জ্জিত হইয়া নামজপ করিতে চেষ্টা করিও। গোস্বামী প্রভুরা জীবকে নামে রুচি দিয়াছেন, আর বিনয় শিখাইয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মদোষে কোনও কোনও সাধক নামজপাদির অভিনয় দ্বারা লোক-প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এই সকল স্থলে নামাপরাধ সঞ্চিত হইয়া থাকে।

দর্প-দম্ভ করিয়া নাম করিতে নাই। ক্রোধপূর্ব্বক নাম করিতে নাই। বৈর-নির্য্যাতনের উদ্দেশ্যে নাম করিতে নাই। মানুষকে ধোকা দিবার

জন্য নাম করিতে নাই। নীচ, হীন, ইতর, জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাম করিতে নাই। ভিন্নমত ভিন্নপথের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নাম করিতে নাই। পাপ গোপন করিবার জন্য নাম করিতে নাই।

এই সব নিষেধ মান্য করিয়া অবিরাম অবিশ্রাম নাম করিতে পারিলে দেখিবে, নাম তোমার ভিতরে অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। তখন নামী আসিয়া কৃপা করিয়া তোমাকে বলিবেন,—"ওরে, আমি দূরে নাই, এই আমি তোরই ভিতরে নিত্য-নিবাস রচনা করিয়া রাখিয়াছি। তোর হৃদয় আমার বৃন্দাবন, তোর চোখের জল আমার যমুনা,তোর পুলক আমার কেলিকদম্ব, আর তুই আমার পরম-প্রার্থিতা শ্রীরাধা।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হও। কোন সমস্যাকেই সমস্যা বলিয়া বিবেচনা করিও না। দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া চলিলে কোন্ কার্য্যে তোমাদের সাফল্য সম্ভব নহে? পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাস নিয়া পথ চল।

নানা স্থান হইতে আমার যে সকল পত্রের নকল পাইয়াছ, তাহা যত্ন করিয়া বেড়ায় গুঁজিয়া না রাখিয়া সকলে মিলিয়া পাঠ করিবে, আলোচনা করিবে, অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। আক্ষরিক ভাবে পত্রগুলি যাহা, একটু ধ্যানের আবেশ নিয়া পড়িলে দেখিবে, তাহাদের অর্থ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। বারবার পড়িতে পড়িতে নূতন নূতন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্ত নিয়া চিঠি লিখি। তাই আমার লেখনীতে যেটুকু অপূর্ণতা থাকে, তাহা পরমেশ্বর নিজে ভাবরূপী হইয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ করিয়া দেন। আমি যতটুকু লিখি, তার চাইতে অনেক বেশী কথা আমার পত্রের মধ্যে থাকে। তোমরা নিজেদের চেষ্টায় সেই অর্থ উদ্ধার করিয়া নিও। গভীর শ্রদ্ধা এবং পরিনিষ্ঠিত অনুরাগ থাকিলে ইহা অতি সহজ কাজ।

গুরু বড় গুরু বস্তু। ভক্তি ও প্রেম দিয়া তাঁহার বাক্য ধরিলে প্রতিটি বাক্য মন্ত্রের মত হইয়া যায়। ক্ষুদ্র একটী বীজমন্ত্র যেমন সাধন করিতে করিতে নিজের ব্যাপক, বিপুল, সুবিস্তার অর্থ ক্রমশঃ প্রকট করিতে থাকে, গুরুবাক্য ভক্তিমান শিষ্যের কাছে তদ্রূপ। "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ",—কথাটা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। ভাবের শুদ্ধি থাকিলে প্রাপ্তির দিক দিয়া কমতি হইবার কোনও কারণ নাই।

বিভিন্ন সঙ্ঘ নানা স্থানে সেবাকার্য্য করিতেছেন। তোমরা সাম্প্রদায়িক-বোধ-বর্জ্জিত ভাবে তাঁহাদের প্রতি সৎকার্য্যে সহযোগ প্রদান করিয়াও নিজেদের চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করিবে। আর, তাঁহারা যেই সকল প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত হইতে অনুপ্রাণনা

নিয়া নিজেরাও স্বাধীন ভাবে সমাজের সেবা করিবার চেষ্টা করিবে।

দেশ ও সমাজকে সেবা দিবার অধিকার ত' প্রত্যেকেরই আছে। কে কত সেবা করিতে পারে, ইহা নিয়া প্রতিযোগিতা কখনও দূষ্য নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতব্যাপী যে সেবাধর্ম্মের নবজাগরণ হইল, তাহা মূলতঃ হৃদয়ের স্বচ্ছ আবেগ হইতে উদ্ভূত হইলেও মুখ্যতঃ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক খ্রীষ্টিয়ান মানব-সেবকদের আচরণ হইতে আর প্রেরণা আহরণ করিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকালীন রাজা-প্রজা-ভিক্ষুদের শিক্ষা ও অনুশাসন হইতে। বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তিগণ সেবাধর্ম্মের প্রেরণা বা শিক্ষা কোথা হইতে গ্রহণ করিলেন, ইহা নির্ণয় সম্ভব না হইলেও, তাঁহাদের আগেও যে জগতে সেবাধর্ম্ম ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারাও পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে কাহারও না কাহারও কাছ হইতে প্রেরণা বা উদ্দীপনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, একথা ভাবিতে দোষ নাই। সুতরাং তোমরাও যদি আধুনিক কালের ঋষিকল্প সেবাধর্ম্মীদের শিক্ষা, উপদেশ ও আচরণ হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া জনসমাজের সেবায় লাগ, তবে তাহা দোষের হইবে বলিয়া মনে করা উচিত নহে। অপরের মন্দ কার্য্যের অনুকরণ করিলে দোষ হয়, কিন্তু সৎকার্য্যের অনুসরণ করিলে দোষ হইবে কেন? বরং তাহা না করাই দোষ।

এক রোগীকে যদি কোনও চিকিৎসক ঔষধ দিতে থাকেন, তখন অপর চিকিৎসকের পক্ষে তাহাকে আবার আর একটা প্রেসক্রিপশান লিখিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, এরূপ করিতে গেলে রোগীর

নিষ্ঠা নাশ পায় এবং সে একবার এই নৌকায় আর একবার অন্য নৌকায় পা দিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে। এই শ্রেণীর কতকগুলি সেবা জগতে আছে। এই সকল স্থলে অন্যের দ্বারা অচিকিৎসিত রোগীকেই সাহায্য করিতে যাওয়া উচিত।

কিন্তু একটী দরিদ্র পরিবারকে কেহ হয়ত কয়েক গ্রাস অন্ন দিয়া গিয়াছেন, অন্যে আসিয়া সেখানে দু'খানা বস্ত্র দান করিয়া যাইতে পারেন, তুমি গিয়া তার স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝেতে শয়ন বন্ধ করিবার জন্য একখানা সস্তা খাট দিয়া আসিতে পার, আর একজন গিয়া তার ছেলের স্কুলে পড়ার মাহিনার টাকা দিয়া আসিতে পারেন, আমি হয়ত তাহার ছেলের পড়ার বহি সরবরাহ করিতে পারি। এই শ্রেণীর কতকগুলি সেবা আছে, যাহাতে একই পাত্রে বহুজনের বহুমুখ সেবা পড়ার অশেষ উপযোগিতা। এই সকল স্থলে বিভিন্ন সেবাসঙ্ঘের সেবার অনুপূরক হিসাবে তোমরা কাজ করিতে পার।

ধর্ম্মীয় মতাদি প্রচারও এক দৃষ্টিতে এক অসামান্য সেবা। কারণ, ইহা পারমার্থিক সেবা। এক স্থানে এক জাতীয় মত প্রচারিত হইয়া লোকের কুশল করিতেছে বলিয়া বুঝিতেছ। সেই সকল স্থলে তোমার একটা নূতন মত নিয়া সাধারণ মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, যুক্তিতর্ক, সমালোচনা প্রভৃতির ঝঞ্ঝা বহাইয়া দিবার ভিতরে সার্থকতা অতি অল্পই রহিয়াছে। কিন্তু যেখানে দেখিতেছ যে, নানা মতের প্রচারকেরা নিজ নিজ মত অশেষ কৌশল সহকারে প্রচার করা সত্ত্বেও এমন একটা দল মাথা জাগাইয়া রহিয়াছেই, যাহারা এসব মত কোনও প্রকারেই গ্রহণ করিবে না, সেই সকল স্থলে নিঃসঙ্কোচে নিজেদের

মত প্রচারের জন্য তোমাদের অগ্রসর হওয়া সঙ্গত। বনের মৃগ, গাভী, অশ্ব হয়ত অনেকেই বশ করিয়াছেন কিন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার আদিই বা কেন অবহেলিত হইবে? তাহাদের মধ্যে তোমরা কাজ করিবে না?

সঙ্ঘে সঙ্ঘে এই ব্যাপারটা নিয়া বড়ই রেষারেষি দেখা যায়। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই মনে করেন যে, প্রচারণার প্রভাবে সমগ্র জগৎকে ইঁহারা নিজেদের মতানুবর্ত্তী করিবেন। কিন্তু এই সহজ সত্যটা ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, জগতের সকলে কখনও একমতাবলম্বী হইবে না। বিচিত্রতা থাকিবেই। প্রচলিত প্রত্যেকটী ধর্ম্মমতের প্রতি আকৃষ্ট জন-সাধারণ যেমন থাকিবে, কিছুতেই এইমত হজম করিতে সমর্থ নহে, এমন কতকগুলি লোকও থাকিবে। সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য মত অন্য পথ আশ্চর্য্যও নহে, অন্যায়ও নহে। সুতরাং তোমরা নিজেদের প্রচারণাকে এই সকল রেষারেষি হইতে দূরে রাখিয়া চলিবে।

কিন্তু অন্যান্য সেবাকার্য্য তোমরা সকলের সাথেই করিতে পার। আলাদা ভাবেও পার, মিলিয়া জুলিয়াও পার। লোকের সেবাটাই তোমাদের প্রধান লক্ষ্য হউক, তোমাদের সুনাম-প্রতিপত্তিটা বড় কথা নহে। কিন্তু তোমরা যদি আলাদা ভাবেই সেবাকার্য্য করা সঙ্গত বিবেচনা কর, তাহা হইলে এই হীনমন্যতার ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া কোনও লাভ নাই যে, অমুকেরা কত বড় সেবাকেন্দ্র করিয়া কাজ করিতেছেন। এক একটা দালানই আট লক্ষ দশ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া তৈরী হইতেছে, এমতাবস্থায় আমাদের কুঁড়ে ঘর হইতে সেবা নিবে কে?

দশ লক্ষ টাকার দালান হইতে সেবা নিবার যেমন লোকের অভাব নাই, স্থান বুঝিয়া কেন্দ্র খুলিতে পারিলে তোমার কুঁড়ে ঘর হইতেও তেমন সেবা নিবার লোকের কখনও অভাব হইবে না। সেবাটাই মুখ্য কথা। আর, অকপট শুভবুদ্ধি নিয়া সেবাকার্য্য সুরু করিয়া দিলে আস্তে আস্তে কুঁড়ে ঘরও লোক-প্রয়োজনেই দালান হইয়া যাইবে।

তোমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা তোমরা এতদিনেও ধরিতে পার নাই। আমি বারংবার তোমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তোমরা প্রায় প্রত্যেকেই চাহিতেছ যে, যত স্থানের যত সেবায়োজন, সব আমি গিয়া যেন সম্পূর্ণ করিয়া কাজ চালু করিয়া দিয়া আসি। ইহা আমার প্রতি তোমাদের অশেষ নির্ভর এবং ভালবাসার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা তোমাদের স্বাবলম্বন-শক্তির অভাবের ও পরিচায়ক। যাহাদের গুরুদেব সমগ্র জীবন স্বাবলম্বী হইয়া চলিলেন বলিয়া কত ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি বক্র, তাঁহার শিষ্যদের ইহা কি সাজে? আর, সেবাকার্য্যের কি ইহাই রীতি? তোমরা কেন নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে জনসেবার আয়োজন নিজেরাই করিবে না? যেখানে যতটুকু পারা যায়, সেখানে যদি মাত্র ততটুকু সেবা দিবার জন্য তোমরা কেন্দ্র খোল, তবে লাগিয়া থাকিবার ফলস্বরূপে একদিন ঐ ক্ষুদ্র সূচনা এক বৃহৎ রূপান্তর অবশ্যই পাইবে। সেবাধর্ম্মে যে বিশ্বাসী, সে এইটুকু কেন বিশ্বাস করিবে না?

তোমাদের প্রত্যেকেরই জনসেবার অল্পাধিক সামর্থ্য রহিয়াছে। ত্যাগের সামর্থ্যও আছে। লক্ষপতি যেখানে লাখ টাকা দান করিতে

পারেন, পথের ভিখারী সেখানে হয়ত একটী ফুটা পয়সা মাত্র দিতে পারে। পরিমাণের এই পার্থক্যের জন্য অকপট ত্যাগীর ত্যাগ মিথ্যা হইয়া যায় না। কোনও একটা উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা প্রতিজনে প্রাত্যহিক একটা ত্যাগের অনুশীলন করিবে, ইহা আমার বড়ই অভিলষিত। দীক্ষাদানকালে তোমাদের স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সাধন পাইতেছ জগন্মঙ্গলের, নামজপ সুরু করিবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে তোমাদের সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, তোমরা

জ গ ে ত ব .

মঙ্গলকারী হইতেছ। এমতাবস্থায় তোমরা কি করিয়া যে দীক্ষা পাইবার এত বৎসর পরেও প্রায় সকলেই জগতের মঙ্গলজনক কাজে হাত না দিয়া থাকিতে পারিতেছ, ইহা আমার নিকটে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। একটা প্রশ্ন যে-কেহ তোমাদের করিয়া বসিতে পারে, "তবে কি দীক্ষা নিয়া তোমরা সাধন কর না?"

নিজের চিত্তশুদ্ধির জন্যই তোমার জন-কল্যাণ-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ প্রয়োজন। কোন্ কাজ করিলে নিঃস্বার্থ জনসেবা হইবে, তাহা তোমারই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এক এক স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুসারে একটা বিশেষ ভঙ্গীর কাজের প্রয়োজন বেশী থাকে। তাহা বুঝিয়াই তোমাদিগকে কর্ম্মতালিকা ঠিক করিতে হইবে। খুব বড় বড় কাজ না করিলে জনসেবা হয় না, তাহা নহে। ছোট কাজও ভগবানেরই কাজ। ছোট বলিয়া কোনও কাজকে হেলা করিতে নাই।

আর একটী কথা মনে রাখিও। যাহার সেবা করিতে যাইতেছ,

সে ভগবান। ভগবান মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া তোমার সেবা গ্রহণ করিবেন। মানুষকে সেবা দিয়া তুমি ভগবানকে সেবা করিতেছ। সেবাধর্ম্মের মধ্য দিয়া তুমি তোমার অন্তরের ভক্তি-ধর্ম্মকে উপচীয়মান করিতেছ। সেবা এক মহতী সাধনা। নামজপের, ইষ্টধ্যানের, হরিকীর্ত্তনের ন্যায় ইহা পরমশুভদ আর একটী পারমার্থিক কাজ। সেবাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মর্য্যাদা দিয়া পূজা-বুদ্ধিতে সেব্যের সেবা করিও। সেবার কার্য্যতালিকা তোমার দেশ-প্রচলিত তালিকাগুলি হইতে কিছু বিশিষ্ট বা বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু তার লক্ষ্য যেন হয় আধ্যাত্মিক। ভগবানকে যতটা ভাল বাসিলে তুমি কামমোহের অতীত হইয়া পরমানন্দ-নিকেতনে পৌছিবে বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস কর, এই সকল সেব্যের দলকে সেই প্রগাঢ়, গভীর, বিপুল, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা অর্পণ করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, পরমেশ্বর জগতের সেবা করিবার জন্য তোমাকে, আমাকে, সকলকে কতক পরিমাণে শক্তি দিয়াই রাখিয়াছেন। সেই শক্তি অপ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া অনেক শক্তিধর পুরুষকে নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া ভ্রমও হয়। তোমার বা আমার ভিতরে যে শক্তিটুকু আছে, তাহা তাঁহারই শক্তি। এই শক্তিকে কাজে লাগাইতে লাগাইতে সে বাড়ে। বাড়িতে বাড়িতে ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডপতির অখণ্ড শক্তিও বিকশিত হইয়া ওঠে। তখন সামান্য মানুষ হয় রাম, কৃষ্ণ, যীশু, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, কবীর।

তোমরা ঈশ্বরদত্ত অতুল শক্তিকে আঘাতে আঘাতে শক্ত করিয়া ক্রমশঃ বিকশিত করিয়া তোল। এই জন্যই ত' আমি বলিয়াছি,

"নবযুগের সাধনা অভিক্ষা।" জনসাধারণের কাছে ভিক্ষা করিয়া চাঁদা তুলিয়া জনসেবা করিবার প্রচলিত পথ পরিহার করিয়া কেবল নিজেদের মধ্যে সহযোগ-বৃদ্ধি দ্বারা এবং তোমাদের নিজেদের ত্যাগের সমবায়ে তোমরা কি করিতে পার, তাহার চেষ্টা দেখ। হয়ত কোথাও কোথাও বুদ্ধির ক্রটিতে বা অভিজ্ঞতার অভাবে অভিক্ষাবৃত্তিকে পূর্ণতঃ বজায় রাখিতে পারিলে না কিন্তু কাজের পথে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে তুচ্ছ হোঁচটকে চিরস্থায়ী পতন বলিয়া নিন্দা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। ক্রটিবিচ্যুতির মধ্য দিয়াই তোমরা তোমাদের অভিক্ষা-সাধনার সিদ্ধি অর্জ্জনে চেষ্টা করিবে। পুপুন্‌কী আশ্রমের এখন বত্রিশ বৎসর চলিতেছে, এখনও আমি সেখানে মাটিই কাটিতেছি, ক্ষেতই করিতেছি, জলাশ্রয়ই নির্ম্মাণ করিতেছি। অসীম ধৈর্য্য নিয়া আমি আমার বত্রিশ বৎসরের পরমায়ু এমন একটা কাজে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, চাঁদা তুলিতে গেলে যাহা আমি কয়েক বৎসরে সমাপণ করিতে পারিতাম। তবু চাঁদা তুলি নাই। কেবল এই একটা কথা ভাবিয়া যে, পঞ্চাশ বছরের পরিশ্রমেও যদি একটা স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরদত্ত আত্মশক্তির জয়জয়কার হইবে। একবার যদি ক্ষুদ্র একটা সেবা প্রতিষ্ঠানও এমন ভিত্তির উপরে দাঁড়ায়, যাহা বাহিরের লোকের অনুগ্রহদত্ত দানের অপেক্ষা রাখিতে বাধ্য হয় না পরন্তু প্রতিষ্ঠানার্জ্জি ত অর্থেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়সঙ্কুলান করিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে এই সুমহৎ দৃষ্টান্ত অনেকানেক শক্তিশালী নব-প্রতিষ্ঠানের জন্মপ্রেরণা যোগাইবে। ইহা এই যুগে প্রায়োজন।

যুগের প্রয়োজন বলিয়াই ইহা আমার অহঙ্কারের বিজৃম্ভণ না হইয়া জীবের প্রতি আমার প্রেম-প্রসারের প্রয়াস হইয়াছে। আমি জীবকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াই ত' এই পথ বাছিয়া লইয়াছি। প্রতি জীব যাহাতে আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়াই শত জীবকে সেবা দিবার সৎসাহস নিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামে, তাহাই ত আমার কাম্য। প্রতি জীব তাহার আত্মশক্তির প্রয়োগ দ্বারা বিপন্ন প্রতিবেশীদের বিপদুদ্ধারে প্রয়াসী হইলে ইহার মধ্য দিয়া সেবকদের যেমন হইতে থাকিবে আত্মশুদ্ধি, সেব্যদের তেমন হইবে দুঃখের মূলীভূত কারণের উপরে সবল আঘাত। কেবল দান করিয়া কাহারও দারিদ্র্য দূর করা যায় না, নিজ দারিদ্র্য দূর করার জন্য সেব্যমানকেও নিজশক্তি প্রয়োগে প্রণোদিত করা আবশ্যক। এখানেও সেবকের প্রয়োজন সেব্যমানের প্রতি অগাধ প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৯শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা সংগঠন-কাজের জন্য সকল রকম ধকল সহ্য করিতে রাজি আছ, লিখিয়াছ। ইহাতে বড়ই

সুখী হইলাম। কিন্তু ধকলের আকৃতিই বা কি, প্রকৃতিই বা কি, তাহা না জানিয়া স্বীকৃতি একটা দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আমি চাহি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ একবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাও। সকল স্থানেই কাজের মুখে নূতন নূতন অপ্রত্যাশিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেই অবস্থার সহিত পূর্ব্বতন কোনও অভিজ্ঞতার মিল নাই। তথাপি পূর্ব্বতন স্থান, পরিস্থিতি ও ঘটনাগুলির সম্যক আলোচনা দ্বারা নিজেদের আত্মপ্রস্তুতিতে উৎকর্ষ আসে। তোমরা অন্য স্থানের অভিজ্ঞতাকে কাজে আনিতে চেষ্টা কর।

দুইটী সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মণ্ডলী তোমরা একত্র করিয়া একটী শক্তিশালী মণ্ডলীতে পরিণত করিতে পারিয়াছ দেখিয়া আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। সাধারণতঃ ঝগড়া-কলহ করিয়া একটী মণ্ডলীকে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া দুইটীতে পরিণত হইতেই দেখা যায়। কোথাও কোথাও মণ্ডলীর কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি অতি বিশাল বলিয়াও কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে একটী মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দুইটী করা হয়। কিন্তু কাজকে পূর্ণ সাফল্য এবং একাগ্র প্রচেষ্টা দিবার জন্য দুইটী মণ্ডলী মিলাইয়া একটী করিয়াছ, এই দৃষ্টান্ত এই প্রথম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের উদ্যম সফলতা আহরণ করুক।

মানুষ যখন মিলিতে চাহে, তখন কোনও কুযুক্তিই তাহাদের মিলন আটকাইয়া রাখিতে পারে না। "হ্যাঁ মশাই, আড়াই মাইল দূর হইতে আসিয়া কি সমবেত উপাসনা করা যায়? যায় না। তার জন্যই ত' আলাদা মণ্ডলী চাই।"—প্রকৃত মিলন-কামীদের মুখে এসব যুক্তি শোনা যায় না। তোমরা তাহারই পরিচয় দিয়াছ।

কিন্তু তোমাদের দুইটী মণ্ডলী প্রকৃত প্রস্তাবে দুইটী আলাদা আলাদা

সহরে অবস্থিত, এমন কথা বলিলে খুব একটা ভুল বলা হয় না। মহিলাদের পক্ষে সমবেত উপাসনায় আসিতে এই দূরত্বটা তুচ্ছ নহে। সুতরাং দুইটী মণ্ডলী মিলিয়া একটী মণ্ডলী হইয়া থাকিলেও দুই স্থানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার তারিখ যেন একই বারে না পড়ে।

মনের বিমলেচ্ছা থাকিলে এক স্থানে একটা কেন্দ্র রাখিয়া একই মণ্ডলীর আওতায় তিন চারি পাঁচটী মণ্ডলী রাখা সম্ভব। কিন্তু কার্য্যে জটিলতা দেখা গেলে এক মণ্ডলী অন্য মণ্ডলীর সহিত অন্তরের প্রীতি রক্ষা করিয়া কাছাকাছি স্থানে কয়েকটী পৃথক মণ্ডলীও হইতে পারে। মণ্ডলী আলাদা হইলেও সকলের মনে রাখা উচিত যে, ইহা অখণ্ড-মণ্ডলী, একের সহিত অপরের সম্বন্ধ খণ্ডনীয় নহে।

সমবেত উপাসনাই যে অখণ্ড-মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান কার্য্যতালিকা, এই কথাটী তোমাদের একজনেরও ভোলা উচিত নহে। সপ্তাহের ছয়টী দিন ত তোমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত হাজার রকমের সংসারী কাজের জন্য রহিয়াই গেল, শুধু একটী দিনের নির্দ্দিষ্ট দুই আড়াই ঘণ্টা সময় কেন তোমরা সমবেত উপাসনার জন্য দিতে পারিবে না? দিতে না পারা অন্যায়। যাহাতে সমবেত উপাসনার এই মিলন-চেষ্টাটীকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়, তাহার জন্য তোমাদের প্রতি জনের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন তোমরা ঠিক নির্ধারিত সময়ে উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিতে পার। "অমুকে আসিলেন না", তমুকে আসিলেন না" বলিয়া নির্ধারিত সময় পার করিয়া কাজ সুরু করার রীতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনও কারণে যাঁহাদের আসিতে দেরী হইতেছে, উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে কোনও না কোনও সময়ে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিবেনই, এই ভরসা রাখিয়া উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাদের দ্বারাই এই কাজটী চালু হইয়া যাওয়া দরকার। আমি ত' কত স্থানে

কাজের চাপে বা অন্য কোনও অপরিহার্য্য অসুবিধার দরুণ সময়মত উপাসনা-মণ্ডপে আসিয়া পৌঁছিতে পারি নাই। উপাসকগণ আমার আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। আমি কোথাও হয় ত' উপাসনা ধরিয়াছি ব্রহ্মগায়ত্রীর সময়ে, কোথাও জপসমর্পণের সময়ে, কোথাও বা অঞ্জলির সময়ে। সময় মত আসিয়া পৌঁছিতে না পারা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই ত্রুটি হইয়াছে। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় এই ত্রুটি কখনো কখনো ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু অন্ততঃ দুই জন উপাসক সময়মত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন অথচ মান্যগণ্যদের আগমনের প্রতীক্ষায় উপাসনা আরম্ভ করিতে দেরী করিতেছেন, এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। যাঁহার উপাসনা হইতে যাইতেছে, তাঁর সম্মানের চাইতে আমার, তোমার বা সহর-নগরের হোমরা-চোমরা কোনও ব্যক্তির সম্মান অধিক নহে। কে আসিতে পারিলেন, কে পারিলেন না, তাহা বিচারের মধ্যে না আনিয়া সমবেত উপাসনা নির্দ্ধারিত সময়ে আরম্ভ করিতেই হইবে। এই বিষয়ে তোমরা দৃঢ় হইও।

দৈবক্রমে কেহ বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, হয়ত ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া অঞ্জলিটা ধরিয়াছেন, ইহাই যদি হয় অবস্থা, তাহা হইলেও বিলম্বকারীকে হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ বা তিরস্কারের দ্বারা উপদ্রুত করিও না। তিনি যে আসিয়াছেন, দেরীতে হইলেও যে যোগরক্ষা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অশেষ-প্রশংসাবহ। যে দেশের মানুষ ঋগ্বেদের যুগে বিশ্বমানবের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, বিশ্বদেবতার পূজা করিয়াছিল, বিশ্বের সকল মানবকে অমৃতের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, সেই দেশের মানুষ আজ দুই তিন হাজার বছর ধরিয়া সঙ্ঘবদ্ধ উপাসনা ছাড়িয়া ব্যক্তিগত সাধনায় দিয়া চলিয়াছে প্রাধান্য, সামূহিক আধ্যাত্মিক চর্চ্চাকে অনাদর করিয়া নিজের রুচি আর নিজের মতিবুদ্ধির দিয়াছে

কৌলিন্য, সকলের সহিত মিলিত হইবার সুযোগগুলিকে পরিহার করিয়া একক, নিভৃত, গোপন এবং একান্তই আত্মকেন্দ্রিক তপস্যার করিয়াছে সমাদর, সেই দেশে তোমরা বিশ্বমানবের সমাজ গড়িয়া তুলিবার শুভ সঙ্কল্পে জগৎকল্যাণকল্পে সমবেত উপাসনার করিয়াছ পুনঃপ্রবর্ত্তন। এই সময়ে যে যে ভাবে তোমাদের অনুষ্ঠানে শুচিশুদ্ধ ভাবে দেয় সহযোগ, তাহাকেই, তাহার ক্ষুদ্র তুচ্ছ ত্রুটিসমূহ উপেক্ষা করিয়া, একান্তই প্রাণের জন বলিয়া অভিনন্দন দিও।

মনে রাখিও, তোমাদের সমবেত উপাসনা একটা তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নহে। এই কারণেই অপরাপর ধর্ম্মসঙ্ঘ দ্বারা প্রচলিত সম্মিলিত প্রার্থনার সহিত ইহার রীতিনীতির কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। তোমরা তোমাদের সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া কেহ সমবেত উপাসনায় যোগ দিও না। সমবেত উপাসনায় যোগদানকালে মনে মনে জানিবে যে, বিশ্বমানবের জন্য বিশ্বমানব হইয়া তোমরা বিশ্বধর্ম্মের যাজনা করিতেছ বিশ্বদেবতাকে লক্ষ্য করিয়া। গণ্ডীর, ক্ষুদ্রতার, সঙ্কীর্ণতার সীমারেখা এখানে লয় পাইয়া গিয়াছে। তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কেবল তোমাদের নিজেদের প্রতি নহে, কেবল তোমাদের ধর্ম্মসঙ্ঘটীর প্রতি নহে পরন্তু বিশ্বের সকল অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত মানবের প্রতি, জগতের প্রতিটী জীবের প্রতি।

এইরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে সমবেত উপাসনাকে দেখিতে পারিলে তোমাদের পক্ষে উপাসনায় যোগদান কোনও অবস্থাতেই কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩০শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ নিবে। পৃথক্ পত্রে তোমাকে চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়া দিয়াছি যে, ভ্রূমধ্য বলিতে আমি কি বুঝি। দুইটী চক্ষুর ঊর্দ্ধদেশে দুই ভ্রূ ধনুকের মত বাঁকাইয়া রহিয়াছে। ভ্রূ-চাপের দুই উচ্চতম স্থান বরাবর সরল রেখা টানিলে এবং নাসিকার ঠিক অগ্রভাগ হইতে দুই ভ্রূর মধ্যখান দিয়া একটী লম্বরেখা টানিলে যেখানে দুই রেখা মিলিত হইবে, সেইটীই তোমাদের ধ্যানের ভ্রূমধ্য। কাহারও কাহারও ভ্রূ-চাপের বক্রতা অল্প। সে স্থলে প্রকৃত ভ্রূমধ্য আরও একটু উপরে হয়। ঐ বিন্দুটীকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় নয়ন কল্পিত হইয়া থাকে।

উপাসনা-কালে চন্দনের ফোঁটা দিতে ঠিক্ সেই স্থলে দিবে,— নাকের ডগায়, নাকের গোড়ায় বা কপালের ঊর্দ্ধাংশে নহে। আমার ললাটে লক্ষ্য করিয়া দেখিও, ভ্রূমধ্য একেবারে পরমেশ্বরের দ্বারাই সুচিহ্নিত হইয়া আছে। কেমন করিয়া ঠিক এই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই কপাল-করোটি অবনমিত হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হইল, কবেই বা হইল, তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু এই চিহ্নটী আমার বাল্য বা কৈশোরে ছিল না। কোন্‌টী ভ্রূমধ্য, কোন্‌টী ভ্রূমধ্য নয়, ইহা নিয়া যেই সময়ে আমার অন্তরে চলিতেছিল দুর্নিবার অনুসন্ধান, সেই সময়ে কোনও

একটা লোকাতীত অনুভূতির পরে খেয়াল হয় যে, নির্দ্দিষ্ট স্থানেই একটী চিরস্থায়ী চিহ্ন হইয়া রহিয়াছে।

তোমরা ইহাকেই ভ্রূমধ্য বলিয়া মানিয়া নিও এবং উপাসনার চন্দনের ফোঁটা ঠিক এই স্থানটীতেই দিও। কপালজোড়া চন্দন লেপিয়া বা যেখানে সেখানে চন্দনের ফোঁটা দিয়া যথেচ্ছাচার করিও না।

কোনও সাধু-সন্ত তোমাদের উপাসনায় যোগ দিতে আসিলে তাঁহার ললাটে চন্দনের ফোঁটাটি দিবার আগে তাঁহার অনুমতি নিয়া লইও। কারণ, অপরে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ললাটে চন্দন দিবে, ইহা হয় ত' কোনও কোনও সাধক-মহাপুরুষ পছন্দ নাও করিতে পারেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩০শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সন্তান হারাইয়া মায়ের মন কেমন হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু তোমার যে সন্তান বিশ্বের সকল শিশু, এই অবসরে তাহার উপলব্ধি লাভ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিও না। কেহ বলিবে, তোমার শিশু স্বর্গে গিয়াছে; কেহ বলিবে, তোমার শিশু গিয়াছে অন্য মাতার গর্ভে পুনর্জ্জন্ম লইবার জন্য। কিন্তু আমি বলিব, সর্ব্বাবস্থায়ই সে জগতের

কোটি কোটি শিশুর ভিতরে করিয়াছে আত্ম-নিমজ্জন, সে বিশ্বের সকল মায়ের আদর পাইবার জন্য সকল শিশুর সহিত এক হইয়াছে। নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া না দিতে পারিলে সে সকলের সহিত মিলিয়া যাইতে পারিত না, তাহার অহং-মমত্ব তাহাকে সকল হইতে আলাদা করিয়া রাখিত। সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া সকলের মধ্যে নিজেকে পাইয়াছে, সে সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম হইয়াছে।

তুমি তাহাকে সর্ব্বত্র পাইবে, যদি সেই দৃষ্টি নিয়া দিকে দিকে তাকাও।

তোমার গর্ভেই সে পুনরায় আসিতেছে। বিশ্বপিতার বিশ্বপুত্র সে ঘরে ঘরে সন্তানরূপে আসিতেছে। বিশ্বমাতার বিপুল বিভূতি অন্তরে বিকশিত করিয়া তুমি সকল শিশুকে স্নেহের আলিঙ্গনে বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হও মা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২রা বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে পুপুন্‌কী আশ্রমে পৌঁছিলাম। এখানেও চিঠির স্তূপ। কাল সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাটিকাটার কাজ চলিবে একটু ব্যাপকতর ভাবে। চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য সরকারী অর্থে মাটিকাটার কাজ চলিলেও আমাদের

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ইহাতে কমে না। সরকারী কর্ম্মচারীরা গরীব লোককে কাজ দিবার জন্য পুকুর, বাঁধ প্রভৃতির মালিকদিগকে নিজ নিজ জায়গায় মাটি কাটিবার জন্য প্রচুর অর্থ দিতেছেন। ঋণ রূপে নহে, দান রূপে পুকুর-বাঁধের মালিকেরা এই টাকাটা পাইতেছেন। আমার চক্ষে এই ব্যাপারটা একটু বেহিসাবী মনে হইয়াছে। আমাকেও পাঁচ হাজার টাকা বাঁধ খুঁড়িবার জন্য দান স্বরূপে দিবার প্রস্তাব সরকারী সজ্জনেরা করিয়াছিলেন। আমি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া এই দান গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করি নাই। যাহাতে দেশে বৃষ্টির জলটা অধিকতর পরিমাণে আটকিয়া থাকে, তাহার জন্য নূতন বাঁধ খনন বা পুরাতন বাঁধের সংস্কার আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ওজুহাতে বাঁধের মালিকেরা এই টাকাটা কেন দানস্বরূপে পাইবেন অথবা সরকারী এজেন্টরা কেন বাঁধের মালিককে রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের কাছে ঋণী না করিয়া জনসাধারণের কাছ হইতে কররূপে সংগ্রহ করা সরকারী অর্থে বাঁধগুলি তৈরী করিয়া দিবেন। ইহার নৈতিক যুক্তি আমার বোধগম্য হয় নাই। তথাপি ইহা দ্বারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকেরা কাজ পাইতেছে, ভিক্ষার অন্ন নয়, সোপার্জ্জনের অন্নমুষ্টি আদায়ের সুযোগ পাইতেছে, ইহা একটা বড় কথা। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে যেটুকু কাজ হইতেছে, তাহাই যথেষ্ট নহে। আমাদেরও করিবার আছে। তাই, আমি ছোট-ভাবে পুপুন্‌কী আশ্রমে যে কাজটুকু সুরু করিয়া দিয়াছি, কি করিয়া তাহাকে ব্যাপকতর রূপ দেওয়া যায়, তাহার উপায় ও অপায় উভয়ই নির্ণয় করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি।

তথাপি তোমরা পত্রের উত্তর চাহ। বারংবার ত' বলিয়া রাখিয়াছি,

একটা লোকে ত' ষাট, সত্তর, আশি হাজার লোকের নিকট পত্র লিখিতে পারে না, মনে মনে প্রতি জনকেই আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতে পারে। সুতরাং তোমাদের মনে সংশয়, সন্দেহ, প্রশ্ন বা সমস্যা জাগিবামাত্র তোমরা হয় অখণ্ড-সংহিতা খুলিয়া তাহা হইতে তোমাদের সমাধান সংগ্রহ করিও, নয় বিগ্রহের সম্মুখে গিয়া অন্তরের ভাব-নিবেদন করিও, নতুবা আমার নামে একখানা পত্র লিখিয়া তাহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিও। পত্রের উত্তর আসুক বা না আসুক, ইহারই ফলে তোমাদের প্রতিটি জিজ্ঞাস্যের জবাব আসিবে।

তোমরা আমার আপন জন। তোমাদের চিন্তা-তরঙ্গ আমার হৃদয়ের তটদেশে আসিয়া আঘাত করিবামাত্র আমার মন তোমাদের সম্পর্কে ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং তোমরা পত্রের উত্তর পত্র দ্বারা পাইতে না চাহিয়া, এই ভাবে সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হও।

অবিচল শ্রদ্ধায় আমাকে যাহারা ভালবাস, তাহাদের জীবনে আমি যে কি দুর্জ্জয় শক্তি, তাহা কি মুখে আমাকে বলিতে হইবে? কিন্তু ভালবাসা বা শ্রদ্ধা গায়ের জোরে তৈরী করা যায় না। ইহা তোমার অন্তরের জিনিষ। অন্তরে যাঁহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতিই সম্ভব। মুখে মুখে যাঁহাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছ অথচ অন্তরে যাঁহার জন্য নাই অকপট শ্রদ্ধা, তাঁহার কিন্তু ক্ষমতা বড় সীমাবদ্ধ। মহাযোগী পুরুষও নিজের শক্তি অগ্রাহী পাত্রে বিতরণ করিতে পারেন না। ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসার মহিমায় মন যদি থাকে তোমার উন্মুখ, সাধারণ যোগীর শুদ্ধ ইচ্ছাও তোমার জীবনে অপরাজেয়। তোমার ভক্তি যে তোমার কত বড় সম্পদ,

তাহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে জগতে ভক্তি ছাড়া আর কিছু তোমার কামনীয় থাকিত না। লোকে জানে না, ভক্তির কত বল, কত তেজ, কত প্রতাপ, তাই তাহারা ভক্তি ছাড়া অন্যান্য হাজার রকম জিনিষের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে।

ভক্তির সহিত এই কথা বিশ্বাস কর যে, তোমাদের নিকট কালী-কলমে পত্র না লিখিয়াও তোমাদের অধিকাংশ প্রার্থনা আমি পূরণ করিতে পারি। আমি ত' দিবস-রজনী তোমাদের কুশল-চিন্তাতেই তনুক্ষয় করিতেছি, নিজের সুখ-সৌভাগ্য-ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা করিবার অবসর আমার কোথায়? চিন্তা বা ইচ্ছা দ্বারাই আমি তোমাদের সকল অভিলাষ পূর্ণ করিব। কেবল এইটুকু চাহি যে, তোমরা নিজেদের ভিতরের একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং আগ্রহকে উদ্দীপিত করিয়া এমন ভাবে যোগ্যতা আহরণ কর, যেন আমার ক্ষীণতম শুভেচ্ছাটুকুও তোমাদের কাছে গিয়া তোমাদিগকে অগ্রাহী, অপাত্র, অভাজন দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া না আসে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩রা বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। রাত্রি এগারটায়

মাঠ হইতে ফিরিলাম। সারাদিন অগ্নিসম উত্তপ্ত রৌদ্র মাথায় নিয়া কাজ দেখিয়াছি। আশ্রমের হিতের মধ্য দিয়া অন্নাভাব-ক্লিষ্ট দরিদ্র লোকগুলির হিত হউক, ইহাই আমি চাহি। আশ্রমের সহিত আমার যেই সম্বন্ধ, এই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষগুলির সহিতও আমার তাহাই সম্পর্ক। একের স্বার্থের ক্ষতি করিয়া অপরের স্বার্থ যেমন দেখা চলে না, তেমন আবার একটীকে লাভবান করিবার জন্য অপরটীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলে না। জনসেবা ও আশ্রমসেবা এতদুভয়ের মধ্য হইতে আত্মসেবাকে দূর করিয়া দিলে ইহাই অবস্থা দাঁড়ায়। আশ্রমের উন্নতি ঘটিলে আমার তাহাতে ব্যক্তিগত লাভ নাই, কারণ আশ্রমের আমি অনুজীবী নহি। তবু লোকগুলির কাজ দেখিতে হইতেছে। কেবল মাটি কাটিলেই টাকা দেওয়া যায় না, আশ্রমের পক্ষে হিতকর ভাবে মাটিটা কাটা হইতেছে, ইহাও দেখিতে হয়।

তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির করিয়া ফেল। হীন যাচকের মত তোমরা সমাজ-মধ্যে বাস করিবে না, তোমরা তোমাদের ভুজ-বিক্রমে সমাজের সেবা করিবার রাস্তা করিয়া লইবে, তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং সঙ্ঘগত ঐক্যে সামঞ্জস্য আনিয়া সমাজ-সেবার নূতন দিগ্‌দর্শন নির্ম্মাণ করিবে, এই বিষয়ে সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেল। তোমাদের মধ্যে সঙ্কল্পের স্থিরতায় যথেষ্ট রিক্ততা রহিয়াছে বলিয়াই প্রায় কোথাওই তোমরা কোনও উল্লেখযোগ্য কার্য্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়া যাইতে পারিতেছ না।

সঙ্কল্পে স্থির হইলে ত্যাগেরও সামর্থ্য আসে। ত্যাগ ছাড়া জগতে

কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। চালাকি ও হুজুগ সাময়িকভাবে ফলোপধায়ক বলিয়া মনে হইলেও পরিণামে ব্যর্থতাই করে দান। তোমরা সত্য সত্য ত্যাগের দ্বারা কাজ করিয়া যাইবে, এই সঙ্কল্প কর।

জগতের যত কাজ সব তোমাকে একাই সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ জেদ আত্মাভিমানের ফল। সকলকে দিয়া কাজে করাইতে করাইতে নিজ কাজ করিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। তোমার চতুর্দ্দিকে তোমার সমগোত্রের নর-নারী যত আছে, সকলেই এমন অপদার্থ যে, তাহাদের একজনকে দিয়াও এক কণা কাজ করান যাইবে না, এই ভ্রান্ত ধারণা তোমার মনে জাগিল কেন? এই ধারণা দ্রুত মন হইতে দূর কর। পার্থিব জগৎকল্যাণ বা জীবের আধ্যাত্মিক কুশল, যে দিক দিয়াই কাজ করিতে চাহ, সকলকে ডাকিয়া আনিয়া কাজে লাগাও এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে লাগ। নিজে কাজ করিব না, কেবল কথাই কহিব আর আদেশ দিব, ইহা যেমন অন্যায়, আর কাহাকেও কাজ করিতে ডাকিব না, কেবল নিজেই খাটিয়া খাটিয়া লয় হইয়া যাইব, ইহাও তেমন মূর্খতা। সকলকে ডাক, সকলকে কাছে আন। যে যেমন কাজের যোগ্য, তাহার হাতে তেমন কাজটুকু তুলিয়া নিজেও নিজের যোগ্য কাজে হাত লাগাও। জীবন, মরণ, জনসেবা, ঈশ্বরসাধন প্রভৃতি সবই আমরা সকলকে লইয়া বরণ করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তুমি তোমার সকল ভ্রাতা এবং ভগিনীদের সঙ্গে এক-প্রাণ, এক-আত্মা হইয়া চলিতে চাহিতেছ, ইহার অপেক্ষা উত্তম প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু যাহাদের সহিত এক-প্রাণ, এক-আত্মা হইতে চাহিতেছ, তাহারা সকলে এবং তুমি নিজে আর একজনের সঙ্গে এক-প্রাণ এক-আত্মা হইয়া লও আগে। ভগবানের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ পাকা না হইলে যাহার সঙ্গেই যে সম্বন্ধ পাতাইতে চাও, সেই সম্বন্ধই ক্ষণভঙ্গুর এবং কাঁচা হইয়া যাইবে। তোমার প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগিনীর নিকটে যাইয়া বল, প্রত্যেকে তাহারা যেন ভগবানের সঙ্গে দেহে, মনে, প্রাণে অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তার পরমবন্ধন অবিলম্বে সৃষ্টি করিয়া লয়। নতুবা ধর্ম্মের নাম করিয়া যে যাহার সহিত যে নিকটত্বই স্থাপন করুক না কেন, তাহার ভিতরেই এমন কতকগুলি দুর্ব্বলতা থাকিয়া যাইবে, যাহা নারকীকে ঠেলিয়া স্বর্গে তুলিবার পরিবর্ত্তে স্বর্গীয়কে টানিয়া নরকে নামাইবে, যাহা লৌহখণ্ডকে স্বর্ণে পরিণত করিবার পরিবর্ত্তে কাঞ্চনপিণ্ডকে কাঁচের অপেক্ষা হেয় করিবে, যাহা পূতিগন্ধ-পঙ্কিল বাসনার স্রোতকে প্রেমের প্রবাহে পরিণত করিবার পরিবর্ত্তে মন্দাকিনী-ধারাতুল্য অকৈতব প্রেমনির্ঝরকে কামের কূপে আনিয়া গণ্ডীবদ্ধ করিবে।

আমি তোমাকে জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত হইতে বলিতেছি না। মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলেই মানুষের পতন হইবে, সকল সময়েই এমন কথা অর্থযুক্ত হয় না। ধর্ম্মের আচ্ছাদন গায়ে দিলে ক্ষণকালের জন্য মনের উপরও তাহার রঙ্গিন ছায়া কতকটা হইলেও পড়ে। সুতরাং বাহ্যতঃ যাঁহারা ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতেছেন, আনন্দোল্লাসে মাতিয়া তাহাদের সঙ্গসুখে কাটাইতে চাহিলে মনের উপর আধ্যাত্মিকতার একটা ছাপ অস্পষ্টভাবে হইলেও পড়েই পড়ে। পরন্তু বাহিরের এই ধার্ম্মিকতার সৌষ্ঠব যদি অন্তরের গভীর গহন পর্য্যন্ত প্রবিষ্টমূল না হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ সংস্রবের ফলে আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর মধ্যেও তামসিকতার দুর্গন্ধ উদগার উঠিতে থাকে।

তাহাই ক্রমশঃ মনে আনে মালিন্য, চিত্তে আনে চঞ্চলতা, দৃষ্টিকে করে ঝাপ্‌সা, বুদ্ধির স্বচ্ছতা করে বিপন্ন এবং ন্যায় ভাবিয়া অন্যায়, অন্যায় ভাবিয়া ন্যায়, ধর্ম্ম ভাবিযা অধর্ম্ম, অধর্ম্ম ভাবিয়া ধর্ম্ম পূজা বা গর্হন পাইতে অরম্ভ করে।

এই জন্যই প্রত্যেকের চাই শক্ত খুঁটি। সেই শক্ত খুঁটি পরমেশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা। তুমি যাহাদের সঙ্গে মিলিতেছ, প্রাথমিক সংস্পর্শে তাহাদের দ্বারা তোমার ও তোমার দ্বারা তাহাদের চিত্তে আধ্যাত্মিকতার স্ফূর্ত্তি ঘটিতেছে। কিন্তু এই সংস্পর্শ দীর্ঘবিলম্বী হইতে থাকিলেও এই আধ্যাত্মিকতার ঔজ্জ্বল্য কি কিছুটা হ্রাস পায় না? যেখানে ঈশ্বরীয় চিন্তাই ছিল একমাত্র উপজীব্য এবং লভ্য, সেখানে কি আস্তে আস্তে নানা প্রকার সাংসারিক আসক্তি ও বৈষয়িক সংসক্তি মাথা জাগাইয়া উঠে না? উত্তর যদি হয় ইতিবাচক, তাহা হইলে তোমাকে বুঝিতে

হইবে যে, তোমার স্থান-ত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছে। ঘনিষ্ঠতা যেই মুহূর্ত্তে সাংসারিকতা, আবিলতা বা অস্বচ্ছতা সৃষ্টি করতে উদ্যত হইবে, তন্মুহূর্ত্তে দূরে সরিয়া যাইবার যে সামর্থ্য, ইহা সংযমী মানবেই সম্ভব।

তোমাকে সংযমী হইতে হইবে। কথায় সংযম, আচরণে সংযম, ইচ্ছায় সংযম পালন করিতে হইবে। যতটুকু কথা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের সংসিদ্ধি লাভের সহায়ক, কথাকে তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে দিবে না। গান, কবিতা, কীর্ত্তন, পাঠ, আলাপ, আলোচনা সব কিছুকে ঈশ্বরীয় দিব্য-জীবন লাভের অনুকূলে এবং অন্তরের সুপ্ত চেতনাকে জাগরিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজনে পরিচালিত করিতে হইবে।

নিত্য নূতন ছন্দের লোক, নিত্য নূতন ঢংয়ের সমাজ এবং নিত্য নূতন রীতির আনুকূল্য ও বিরোধিতার সম্মুখীন তোমাদিগকে হইতে হইতেছে। এই নূতনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য যে নিপুণতার প্রয়োজন, তাহাতে চঞ্চলতারও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এই আবশ্যকীয় চঞ্চলতাকে একটা চিরস্থির জীবন-শৃঙ্খলার সহিত যুক্ত করিয়া চলিবার ধৈর্য্য এক কম সংযম নহে। রূপান্তর যখন এক পরম সত্য হইতে সেই অসীম অনন্ত পরম সত্যেই ঘটিতেছে, তখন এই চঞ্চলতাকে ক্ষতিকর বলিয়া আখ্যাত করা চলে না।

তোমাকে পুনরায় বনপর্ব্বতবাসী নরনারীদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। মনে রাখিও, এই সরল-স্বভাব-অরণ্যচারী মানবগোষ্ঠী সমূহের সেবা করিতে যাইয়া তোমার ভিতরে যেন অহমিকা প্রবুদ্ধ হইয়া না উঠে। স্বীয় কর্ম্মের সহায়কদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে খুঁজিয়া বাহির কর। সকলের মন হইতে অহমিকাকে দূর করিয়া দিয়া প্রত্যেককে

একান্তভাবে ঈশ্বরানুগত করিয়া তবে সকলের শক্তি এক সময়ে একই জায়গায় প্রয়োগ কর। একই সময়ে একই স্থানে সকলের সর্ব্বশক্তি যদি ক্ষণকালের জন্যও প্রযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে মিলনের মহাপুণ্যে সেই একটিমাত্র মুহূর্ত্তে এক অসাধ্য-সাধন সম্ভব। ক্ষুদ্রেরা ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু সকল ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যদি যুগপৎ একই কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তবে তাহার শুভফল অভাবনীয়ভাবে বিশাল হইয়া থাকে। এক সঙ্গে সকলের শক্তি প্রযুক্ত হয় না বলিয়াই তথাকথিত বড়রা উল্লেখযোগ্য কোনও বড় কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

চতুর্দ্দিকের তোমার সকল ভাইবোনদের ডাক। দশ-বার মাইলের ভিতরে তোমাদের জন্য বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে, হউক না পাহাড়, হউক না পর্ব্বত, হউক না দুর্গম বন্ধুর শৈলপথ, সেখানেই তোমাদিগকে যাইতে হইবে। প্রাচীন ঋষিরা একদিন যেমন করিয়া ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ", তেমনি করিয়া তোমরাও ডাকিয়া কহ—"হে বনপর্ব্বতবাসী অবহেলিত মানব-সমাজ, তোমরা হেলার পাত্র নহ। তোমাদিগকে আমরা অমৃতের পথে টানিয়া লইতে চাই। তোমাদিগকে সেবা করিবার শাশ্বত অধিকার আমাদের দাও, সেবিত হইবার জন্য নহে,—সেবা করিবার জন্যই তোমাদের জীর্ণ-দীর্ণ- পর্ণকুটীরে দলে দলে আমরা আসিয়াছি।"

নিজেদের অকপট সত্যোক্তি দ্বারা ইহাদের মনে বিশ্বাস-ভূমি সৃষ্টি কর। যে যাহাকে বিশ্বাস করে না, সে তাহার সেবা নেয় না। তোমরা বিশ্বাস কর ইহারা নারায়ণ,—অন্ত্যজ অনার্য্য ইতর ব্যক্তি নহে। নারায়ণ-জ্ঞানে পূজা-বুদ্ধিতে সেবা-হস্ত সম্প্রসারিত কর। দিনের পর দিন

উপযুক্ত সময় যে কেবলই পার হইয়া যাইতেছে, একথা নিমেষের তরেও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদিগকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যতগুলি পত্র দিয়াছি সবগুলি পত্র বাক্স-তোরঙ্গ হইতে বাহির কর। সবগুলি পত্র দুইবার, তিনবার, চারিবার করিয়া আগাগোড়া পড়। আমি সাহিত্য রচনার জন্য পত্র লিখি নাই। লিখিয়াছি, তোমাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য, অধিকাংশ পত্রেরই নকল আমার নিকটে নাই। কিন্তু যাহা লিখিয়াছি, তদনুযায়ী কাজ যদি তোমরা না করিয়া থাক, তাহা হইলে পত্র লেখার সার্থকতা কি হইল? পত্রগুলি বারংবার পড়। বারংবার পড়িয়া পড়িয়া তোমার সতীর্থদিগকে শুনাও। পত্রগুলি তোমরা পড় নাই বলিয়াই সেগুলি মরিয়া যায় নাই। আমি প্রাণ নিঙ্গাড়িয়া লিখিয়াছি, তোমাদিগকেও প্রাণ মন দিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে।

বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী তোমাদের অস্তিত্বের কোন মূল্য নাই। বিশ্বের ছোট-বড় সকলের সহিত যেখানে তোমাদের মিলন,

সেইখানেই তোমরা অখণ্ড। যতটুকু তোমাদের মিলন, ততটুকুই তোমরা অখণ্ড, তোমরা সত্য সত্য অখণ্ড হও, ইহাই আমি চাহিতেছি। রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া এখন তোমরা পাহাড়-পর্ব্বত অঞ্চলে আসিয়া বসবাস সুরু করিয়াছ। চতুর্দ্দিকে যাহাদের দেখিতে পাইতেছ, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা, আচার-ব্যবহারে ইহারা কেহই তোমাদের অপেক্ষা অগ্রসর নহে। ইহাদের মধ্যেই ত' সর্ব্বাগ্রে তোমাদের প্রবেশ করিতে হইবে সর্ব্বশক্তি লইয়া। যাহাদিগকে সভ্য মানবেরা চিনে না, জগতে তাহাদের সংখ্যা কম নহে। অথচ বিধাতৃ-বিধানে ইহারা তোমাদের নিকট প্রতিবেশী। ইহাদের সম্পর্কে অন্ধ বা উদাসীন হইয়া তোমরা থাকিতে পার না।

তোমাদিগকে "হরি-ওঁ কীর্ত্তন", সমবেত উপাসনা" প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই সকল অনগ্রসর আদিম জাতির লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে বলিয়াছি। কেহ কেহ ভাগবত-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এসব নিভৃত শান্তির আগার-স্বরূপ স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যেও "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের বিরোধ করিয়া নানা উত্তেজক কথাবার্ত্তা পরিবেশন করিয়া তোমাদের অকারণ মনঃক্ষোভ এবং জনসাধারণের সহজ-বিশ্বাস-প্রবণ সরল চিত্তে অনর্থক দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন যে অশাস্ত্রীয়, ইহা প্রমাণের জন্য ইঁহাদের উদ্যমের অন্ত-অবধি নাই। ইঁহাদের যুক্তি-তর্কের বহর লইয়া ইঁহারা সুখে থাকুন, তোমরা ঐ বিষয় নিয়া বৃথা বিদ্বেষে মাতিও না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন হরেকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নবদ্বীপে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন লোকে এই সম্পর্কে কি বলিয়াছিল, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সুস্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন।

"........হিন্দুর ধর্ম্ম নাশিল নিমাই
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।।
মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-যোগ্য আচরণ।।" (আদি, ১৭)

এ সকল মন্তব্য হিন্দুরাই করিয়াছিলেন, মুসলমানে নহে। মনসা, মঙ্গলচণ্ডী ও বাসলী দেবীর পূজায় মদ্য-মাংসাদি আহার করিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সহকারে রাত্রি-জাগরণ করাই ছিল তৎকালে ভদ্রলোকের যোগ্য আচরণ। চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবন দাস তৎকাল-প্রচলিত ব্রাহ্মণ-সমাজের যে বিবরণ দিয়াছেন বা জয়ানন্দ ও লোচনদাস "যোগ্য আচরণকারী ভদ্রলোকের" অনুষ্ঠিত কার্য্যের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পত্রযোগেও তোমাদিগকে উপহার দিবার যোগ্য নহে। নিমাই হরেকৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া যে নদীয়াবাসীকে নূতন জিনিষ শুনাইলেন আর ইহার দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মই নাশ করিলেন, ইহাই ছিল বিরুদ্ধবাদী জনগনের, বিশেষ করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি-শালী নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণগণেরও সুস্পষ্ট অভিমত। সুতরাং তোমরা "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম নাশ করিতেছ বলিয়া যদি আজ অভিযোগ হয়, তাহা হইলে এককথায় তাহা তোমরা নাকচ করিয়া দিতে পার। তোমরা কাহাকেও "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করিতে গায়ের জোরে বাধ্য করিও না। কিন্তু নিজেরা প্রাণভরা উদ্দীপনা এবং হৃদয়ভরা বিশ্বাস নিয়া এই নামের কীর্ত্তন গাহিয়া যাও। কোন্ নাম গাহিতেছ, তাহা অপেক্ষা বড় কথা হইতেছে, প্রেমভরে গাহিতেছ কি না। "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" প্রভৃতি নামগান বৈদিক মন্ত্রাদির ন্যায়

প্রাচীন নহে। এমন কি উপনিষদীয় যুগেও এই নাম কেহ গাহিতেন না। তার বহু-পরবর্ত্তী মহাভারতীয় যুগেও কেহ হরেকৃষ্ণাদি নামগান করেন নাই "হরেকৃষ্ণ" নাম ইহার বহু পরে জন-সমাজে প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নিজ রচনায় প্রমাণিত হইতেছে যে, এই সেই দিন, অর্থাৎ সাত শত বৎসর পূর্ব্বের নদীয়াবাসীরা ইহাকে নূতন প্রবর্ত্তন এবং হিন্দুধর্মনাশক বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। তথাপি এই নামকীর্ত্তন জগতে সগৌরবে চলিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, "হরেকৃষ্ণ" নাম যাঁহারা গাহিয়াছেন, তাঁহারা প্রেমভরে গাহিয়াছেন, ঈশ্বরচরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া গাহিয়াছেন, দর্প-দম্ভ-অহঙ্কার বিসর্জ্জ ন দিয়া গাহিয়াছেন, ভগবানকে এবং জীবকে ভালবাসিয়া ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে এবং আর্ত্ত, অন্ধ, বিপন্ন জীবের প্রতি পরমকরুণা লইয়া গাহিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রেমই এই নাম-গানকে যশস্বী, জয়িষ্ণু এবং শাশ্বত করিয়াছে।

তোমরা বৈষ্ণব সাধকদের জীবন হইতে এই অনুপম-সুন্দর দৃষ্টান্তটুকু ভক্তিভরে আহরণ কর এবং যেই প্রেমভক্তি তাঁহাদের জীবনে যমুনা উজান বহাইয়াছিল, পরমেশ্বরের প্রতি সেই অপার্থিব ভক্তিধন অর্পণ কর। ভক্তির কুসুমাঞ্জলি রূপে নিজ নিজ জীবনকে পরমেশ্বরের পাদপদ্মে উপঢৌকন দিবার জন্য যখন হইবে প্রস্তুত, তখন তোমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, রূপ ও পদ-মর্য্যাদা প্রভৃতি কোনও কিছুর দিকেই না তাকাইয়া শত শত নরনারী আকুল প্রেমে তোমাদের সহিত "হরি-ওঁ" মহানাম গাহিতে সুরু করিবেন।

যাঁহারা অন্যান্য নামে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাদের কীর্ত্তনীয় এই "হরি-ওঁ" নামের প্রতি অনাস্থা, বিদ্বেষ বা কদুক্তি ও কটুক্তি সমূহ বর্ষণ করা সত্ত্বেও তোমরা একদিকে থাকিও নিজেদের নামে অটল অচল, অপর দিকে থাকিও সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা কীর্ত্তনীয় বিভিন্ন নাম-গানের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান্। অপরের নাম-কীর্ত্তনকে উপহাস, বিদ্রূপ বা নিন্দা করিবার কুপ্রবৃত্তি তোমাদের যেন কখনও না হয়।

"হরি-ওঁ" এই তিনটী অক্ষর হিন্দুশাস্ত্রের কোথায় আছে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞদের অনুসন্ধান করিতে দাও। খুঁজিলেই তাঁহারা যথাস্থানে ইহা পাইবেন। তোমরা গুরুবাক্যরূপে "হরি-ওঁ" নাম তোমাদের কীর্ত্তনীয় রূপে পাইয়াছ, তোমাদের আর কোনও শাস্ত্রানুসন্ধান বা শাস্ত্রীয় ভিত্তি আবিষ্কারের জন্য প্রত্নতত্ত্বের মৃত্তিকাখননের প্রয়োজন নাই। নানক বা মহম্মদ শাস্ত্র খুঁজিয়া শিষ্যদের জন্য মন্ত্র বাহির করেন নাই, তাঁহাদের শিষ্যরা গুরুবাক্যকেই শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন তোমাদের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি বাসমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। অপরেরা এই নাম কীর্ত্তন করিবার আগে বরং শাস্ত্র খুঁজিয়া দেখুন যে, ইহার প্রামাণ্য কি অপ্রামাণ্য এবং তাঁহারা নিজেদের প্রাণের গতি ও মনের রুচি বুঝিয়া ইহা গ্রহণ বা বর্জ্জ নকরুন। কিন্তু তোমাদের পক্ষে ইহা গুরুবাক্য। সুতরাং শাস্ত্রে "হরি-ওঁ" আছে কি নাই, ইহা নিয়া এক কণাও ব্যতিব্যস্ত তোমরা হইও না। তোমরা তোমাদের বীজমহামন্ত্রের পরম স্মারক ও ব্যাখ্যাতা

রূপে "হরি-ওঁ" নাম-কীর্ত্তনকে আমৃত্যু নিষ্ঠায় ধরিয়া রাখ। জগতে যদি একটী প্রাণীও তোমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ না দেয়, তাহা হইলেও তোমরা বিচলিত হইও না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড একদিক হইয়া বিরুদ্ধতা করুক, আর তোমরা এক কোণে একঘরে, অপাংক্তেয়, নিন্দিত এবং তিরস্কৃত হইয়াও কেবলই গাহিয়া যাও—"হরি-ওঁ", "হরি-ওঁ", "হরি-ওঁ", "হরি-ওম্"।

সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তাও পরিহার কর। দুশ্চিন্তা দুঃখ এবং ব্যাধির জনক। নির্ভর পরমসুখদ ও স্বাস্থ্যপ্রসাদক। কে কি কহিল, কে কি করিল, কে ঘরে আগুন লাগাইল, কে তোমার প্রতি আক্রোশ বশত তোমার বন্ধুদের কুপরামর্শ দিয়া বিগড়াইল,—সব চিন্তা ছাড়িয়া দাও। এই পার্থিব শরীর লইয়া তুমি বা আমি কে কয়দিন জগতে রহিব, কে বা কাহার হস্তধৃত পতাকা কোন্ ভাগ্যধরের হাতে সঁপিয়া যাইব, সব দুশ্চিন্তা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র পরমেশ্বরে নির্ভরের দ্বারা নিশ্চিন্ত হও। নিশ্চিন্ততাই জীবন-সাধনার অর্দ্ধেক সিদ্ধি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি ওঁ

কলিকাতা

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের

দুই জনের সেবা-যত্নে দুইটা দিন মুগ্ধ ছিলাম। যে দম্পতীর এত ভক্তি, ভগবান তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বিরাজ করেন। গৃহি-জীবনকে অনেকে ভয় পাইয়াছে কিন্তু তোমাদের ন্যায় ভক্তিধনের যাহারা অধিকারী, তাহাদের সংসারে ভয় করিবার কিছু নাই। ভগবানের নাম নিয়ত স্মরণ করিতে করিতে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া তোমরা সংসার-সাগর উত্তরণ কর।

তোমরা মুষ্টিমেয় যে কয়জন ঐ অঞ্চলে আছ, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে অপার্থিব আত্মীয়তার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। অন্য কোনও বাহ্য উপায়ে তাহা স্থায়ীভাবে সম্ভব হইবে না। নিজেদের প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত উপাসনায় যদি প্রত্যেকে ভগবানে মন মজাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হও এবং এই ভাবে কিছুকাল সাধন করিয়া যাইতে থাক, তাহা হইলে তোমাদের প্রকৃতির যে রূপান্তর ঘটিবে, তাহা একজনকে অপরের অতি সন্নিকটবর্ত্তী করিবে। ইহা একটা পরীক্ষিত সত্য। পরমেশ্বরের একই নামে যাহারা নিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রত্যহ মন মজায়, তাহাদের স্বভাবে, রুচিতে, অনুভূতিতে ও অন্তর্বাহ্য যাবতীয় লক্ষ্যের মধ্যে একটা অকল্পনীয় সমতার সৃষ্টি হইয়া যায়। চেষ্টা করিয়া ইহা করিতে হয় না, আপনা আপনি ইহা হইয়া যায়।

তোমরা যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত উপাসনা নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ করিয়া থাক, তাহারা যখন আবার নিয়মিত ভাবে তোমাদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় মিলিত হইতে থাকিবে, তখন কিছুকাল পর হইতেই দেখিবে যে, তোমাদের সকলের মধ্য হইতে বৈষম্যগুলি অতি দ্রুত অথচ তোমাদের অজ্ঞাতসারে বিলোপ পাইতেছে। ইহাও আপনা

আপনিই হয়, জোর করিয়া করিতে হয় না। সমবেত উপাসনাটী যে কত বড় শক্তিসংগ্রাহক অনুষ্ঠান, তাহা তোমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম রহিয়াছ, শুধু অনুষ্ঠানটুকু প্রায় কেহই প্রাণমন দিয়া কর না বলিয়া। শক্তির উৎস তোমাদের নিকটে স্বর্ণভৃঙ্গারে ভরিয়া আমি উপস্থিত করিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া পান করিবার অবসারটুকু তোমরা গ্রহণ করিতেছ না। তোমাদের এইটুকুই মাত্র ত্রুটি।

এই ত্রুটি তোমরা সংশোধন কর।

আমি তোমাদের অনেকগুলি মন্ত্র দেই নাই, অনেক দেবতা দেই নাই, সাধন-ভজনের জটিল গ্রন্থিল কুটিল প্রণালী দেই নাই, বহু বহু উপদেশ প্রদান করি নাই। দিয়াছি একটী মাত্র মন্ত্র, একটী মাত্র আরাধ্য, একটী মাত্র কৌশল, একটী মাত্র লক্ষ্য আর একটী মাত্র উপদেশ। একের মহিমাকে নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া সকল বহু একে মিলিয়া গিয়াছে। তাই আমি তোমাদের একত্র করিতে চাহিয়াছি। তোমরা আমার এই চাওয়াটাকে ব্যর্থ করিয়া দিও না। তোমরা একত্র হও, তাহার ফলে একদা কোটি বৈষম্যের মাঝে লক্ষ কোটি আত্মা মিলিয়া একটী পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়া যাইবে।

ধনী এবং দরিদ্র পাহাড়বাসী আর সমতলবাসী, অরণ্যচারী আর নগরবিহারী, সুসভ্য ও অসভ্য, শিক্ষিত ও মূর্খ সকলে তোমরা একের মন্ত্রে এক হও। আর দেরী করিবার সময় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৯ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস জানিও। তোমার ৩রা বৈশাখের পত্র পাইয়াছি।

সম্প্রদায়বুদ্ধি অন্তরের সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকদের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিভেদ জন্মায়। ধর্ম্মের নামে সম্প্রদায় গড়িবার মধ্যে ইহাই ত' সকলের চেয়ে অধিক আপত্তিজনক ব্যাপার। অথচ ধর্ম্মের বিকাশই হইয়াছিল এক মানুষকে অপর মানুষের আপন করিবার জন্য। ধর্ম্ম প্রথমে বিশ্ব-পিতার সহিত সকলের ব্যক্তিগত আত্মীয়তা-সৃজন করিয়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সর্ব্বজনীন আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহাই জগতের আদি ধর্ম্মদ্রষ্টাদের অন্তরের সত্য অনুভূতি। কিন্তু ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব আসিল তখন, যখন এক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীরা অন্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীদিগকে পর বলিয়া জানিল।

ধর্ম্মসঙ্ঘ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কি প্রয়োজন নাই? তাহাও আছে। একই মতের মতীরা একত্র হইলে পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের অগ্রগমনের পরিবেশ সৃষ্ট হয়। সতীর্থ থাকিলে ধ্যানে মননে অভিনিবেশ বাড়ে।

ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহ নিজ নিজ মত ও পথের মহিমা জগজ্জনের

কাছে প্রচার করিতে যাইয়া কেবল স্বদলপুষ্টিই করে না, পরন্তু নিজেদের মতে পথে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসও ইহাতে বাড়ে। এই দুই কারণেই নিজমত প্রচারের কার্য্যকে কেহ দোষণীয় মনে করে নাই। কিন্তু নিজমত প্রচারের অত্যধিক উৎসাহে যখন ভিন্নমতকে আক্রমণ ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে আঘাত প্রদানই রীতি হইয়া দাঁড়াইল, তখন এই অতি সুন্দর ও সৎ কার্য্যটীও ঘোরতর উপদ্রবের কারণ হইয়া পড়িল।

নিজেরা যাহারা সাধন করে, তাহারা যখন মত-প্রচারে নামে, তখন তাহাতে পরধর্ম্মগ্লানির সম্ভাবনা অল্পই থাকে। কারণ, প্রকৃত সাধন-নিষ্ঠ ব্যক্তির পরনিন্দা পরচর্চ্চায় রুচি থাকে না। কিন্তু প্রচারকত্বের জন্যই যাহারা প্রচারক,তাহাদের দ্বারা অপরের গ্লানি-প্রচারই অধিক হয়, মানুষে সত্যধর্ম্মে টানিয়া আনিবার চেষ্টায় ভাটা পড়ে।

প্রচার কেবল চোপার জোরেই হয় না। বক্তৃতামঞ্চ হইতে বড় বড় কথা বলিতে পারার অপেক্ষাও নিজের ধর্ম্মের সাধনাটুকু নিজের জীবনে নিষ্ঠার সহিত অনুশীলন করার মধ্যে প্রচারের যোগ্যতা অধিক রহিয়াছে। তথাপি-মৌখিক প্রচারের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু শত কলকণ্ঠ হইলেও একজন প্রচারকের পক্ষে এক যোগে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন বা বহুশত বৎসর ব্যাপিয়া জীবন ধারণ সম্ভব নহে। এই জন্যই প্রচার-সাহিত্যের প্রয়োজন।

নিজেদের মত-পদ প্রচার করিতে যাইয়া সেই প্রচার-সাহিত্য ভিন্ন-মতের প্রতি যত অধিক সহনশীল হইবে, ততই তাহা হইবে সর্ব্বজনের পক্ষে গ্রহণীয়। সাহিত্য দ্বারা সকলের সহিত যোগরক্ষা ও প্রেম-

বন্ধন-সৃষ্টির সহায়তা হয়। সুতরাং প্রচার-সাহিত্যের প্রয়োজন আছে।

তোমাদের কোনও সাহিত্য আছে বলিয়া তোমরা জান কি? সেই সাহিত্য তোমরা পড় কি? সেই সাহিত্যের সহিত সকল মতের সকল পথের চিন্তাশীল সুজনগণের অন্তরের পরিচয় যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা তোমরা করিয়াছ কি?

তোমাদের নিজেদের সাহিত্যের সহিত তোমাদের নিজেদের পরিচয় না থাকার দরুণ বিশ্বাসে আচরণে নিষ্ঠায় তোমরা জনে জনে হীনবল হইয়া পড়িতেছ কিনা, তাহাও ত' হিসাব করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে।

সংখ্যায় তোমরা যেখানে যত অধিক, নিজেদের সঙ্ঘের সাহিত্যের সহিত যোগাযোগ না রাখার দরুণ সেখানে প্রায় প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের মতের অমিল ও গোঁজামিলের সম্ভাবনা তত বেশী। ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি?

হয়ত ইহা লক্ষ্য করিয়াছ এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই তুমি প্রত্যেকটী সতীর্থকে সজাগ করিবার চেষ্টায় নামিয়াছ। কিন্তু একার চেষ্টায় ইহা হইবে না, তোমাদের মধ্যে কর্ম্মক্ষম এবং বুদ্ধিমান প্রায় প্রতিজনকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। "জাগো—জাগো", "নামো—নামো" বলিয়া সকলে মিলিয়া চীৎকার করিলেই হইবে না, প্রতিজনকে নিজে আগে জাগিতে হইবে এবং অপর সকলকে ঘুম হইতে টানিয়া তুলিতে হইবে। জাগরণের কি আনন্দ, তাহা নিজে না জাগিলে কি করিয়া বুঝিবে? অপরের ঘুম ভাঙ্গানোতে যে কি আনন্দ, তাহাই বা হাজার বার অসফল হইবার পরেও প্রাণপণ করিয়া সত্য সত্য একবার সফল

হইবার আগে কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? কেবল কথায় আর পরামর্শে সময় কাটাইলে চলিবেনা, কাজে তোমাদের লাগিতে হইবে।

বিশেষ করিয়া যে দুই তিন জন কর্ম্মী নারী-পুরুষের নাম তুমি করিয়াছ, তাহাদের রুচি এবং যোগ্যতা সত্যই রহিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মান-অভিমান বিসর্জ্জন না দিয়া নিজ নিজ রুচি ও যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করা ত' চাহি! "ঐ ত' সেদিন দুইটী সপ্তাহ জুড়িয়া কি কঠোর পরিশ্রমই না আফিস-স্কুল কামাই করিয়া করিলাম, কেহ ত আমাদের শ্রমের এক বিন্দু প্রশংসা করিল না,"—এই সকল ভ্রান্ত যুক্তির পাহাড় তুলিয়া নিজের ভ্রূযুগের সম্মুখে দাঁড় করাইতে থাকিলে কার কাছ হইতে কোন্ কর্ম্মটুকুর তুমি প্রত্যাশা করিবে বাবা? সত্যই সেদিন আমি ইহাদের পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। ইহাদের পরিশ্রম ইহাদের অভ্যাস ও রেওয়াজের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই জন্যই যে ইহাদের অত সহজে ক্লান্তি আসিল, এত সহজে মন দুর্ব্বল হইল, এত সহজে ভয়-ভীতিতে মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল, ইহাও কি সত্য নহে? এই জন্যই যে ইহাদের বিপুল শ্রমও কেমন জানি ছন্দোহীন ও সঙ্গীতি-বর্জ্জিত একটা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মত নীরস মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, ইহাও কি সত্য নহে? কর্ম্ম কেবল কর্ম্মই নহে, ইহা যোগ। কর্ম্ম কেবল কর্ম্মযোগই নহে, ইহা সঙ্গীত। পরিশ্রম ত' স্বচক্ষে দেখিলাম কিন্তু সঙ্গীত জাগিল কৈ? কর্ম্মীদের হাতের, পায়ের, মুখের, চোখের, সমগ্র শরীরের তালে তালে সঙ্গীতের ঝঙ্কার মুখরিত হইয়া উঠিল কৈ? এই দেখিলাম অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস, এই দেখিলাম হঠাৎ অতিরিক্ত অবসাদ। এই দেখিলাম নিদারুণ কর্ম্মোত্তেজনা, এই

দেখিলাম ঝিমাইয়া পড়া আবেগ আর মিয়াইয়া পড়া প্রতিজ্ঞা। ইহাকে ত' কেহ সঙ্গীত আখ্যা দিবে না!

কর্ম্মী যাহারা আছে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে তাহাদের প্রতিজনকে ডাকিয়া আনিয়া বল যে, আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সেদিন যদি প্রাপ্য প্রশংসার চাইতে কম পাইয়া থাক বলিয়া অভিমান আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সমগ্র অতীত জুড়িয়া যে প্রাপ্যাতিরিক্ত প্রশংসার শেফালী-বর্ষা তোমাদের শিরে ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার কথাও স্মরণ কর। আরও মনে রাখ যে, প্রকৃত কর্ম্মী নিন্দায় বা প্রশংসায় কেন টলিবে? সে তাহার কর্ত্তব্য সর্ব্ব অবস্থায় অটল অচল দৃঢ়তার সহিত সম্পাদন করিয়া যাইবে। ইহাই তাহার আদর্শ।

যে কাজ তুমি একাই করিতে পার, তাহাতেও দশের হাত ও মাথা লাগিলে সুফল হইবে স্থায়িতর। তুমি একা যতটুকু করিতে পার, দশের সহযোগে তাহার ব্যাপকতা দশ, পনের, বিশগুণও হইতে পারে। এই শুভ সম্ভাবনাগুলির দিকে তাকাইয়া তুমি সর্ব্বকার্য্যে এবং সর্ব্বক্ষেত্রে দশের সহযোগ আকর্ষণের দিকে লক্ষ্য দিও। কিন্তু এই দশ যেন এমন দশ হয়, যাহাদের চরিত্রে ভান নাই।

কাজ করিব না অথচ কাজের ভান করিব, ভার নিব না অথচ ভার নিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বেড়াইব, নিজে কিছুই করিব না অথচ অপরে কোথায় কর্ত্তব্য হইতে পরাঙ্মুখ হইল, ভীরুতার আশ্রয় লইল, দুর্ব্বলতা দেখাইল, তাহা নিয়া তত্ত্বোপদেশপূর্ণ গবেষণা-রাশি রচনা করিব,—এমন লোকেরা বিপজ্জনক। সহযোগের জন্য এমন লোকদের মুখপানে কখনও কাতর সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইও না। কারণ, ইহাদের

উপরে নির্ভর করার মতন কর্ম্মনাশা ব্যাপার আর সর্ব্বনাশা ক্ষতি আর কিছুতেই হইতে পারে না।

চারিদিকে চক্ষু ফিরাও। সপ্রেম নয়নে চারিদিকে তাকাইয়া দেখ। অন্ধকারের আড়াল দিয়া নগন্য ব্যক্তিরা যেখানে আত্মগোপন করিয়া নীরবে বসিয়া আছে, সেখানেও একবার তাকাইয়া দেখ। তোমার সপ্রেম নিঃশ্বাসের উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাদের জন্মযুগের শীতাহত চিত্তে একটু আরামের সৃষ্টি করিলেও করিতে পারে। হয়ত তোমার আদর্শ-কর্ম্মীরা অধিকাংশেই সেই অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন স্বাস্থ্য-শক্তি-সৌষ্ঠবহীন গভীর গহবর হইতে ছুটিয়া বাহির হইবে। প্রেমের বাতি জ্বাল, প্রেমের অনলে অন্ধকারের নির্ব্বাসন কর, প্রেমের প্রতাপে কর সৃষ্টি নূতন জগতের নবীন ইতিহাস। পৃথিবীতে যাহারা নিত্য নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে, জানিও, তোমারই তাহারা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৯ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমরা শুভ পয়লা বৈশাখ তারিখটীকে উৎসব, কীর্ত্তন, উপাসনা, পাঠ, ব্যাখ্যান

প্রভৃতির দ্বারা সম্মান করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম। পয়লা বৈশাখও এই উপলক্ষ্যে তোমাদের প্রতি অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞানাইয়া গেল। পয়লা বৈশাখ তোমাদের কাছে কেবল বৎসরেরই প্রারম্ভ নহে, ইহা তোমাদের নিকটে অন্ধকার ধরণীতে আলোক-প্রবেশের প্রতীক।

নিজেরা সাধনা করিয়া শক্তিলাভ কর। জ্ঞানই শক্তি। তোমরা সাধনা করিয়া জ্ঞান লাভ কর। প্রতি পয়লা বৈশাখ তোমরা অনুভূত সত্য এবং উপলব্ধ জ্ঞানকে নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ কর। সকল জ্ঞানীকে কর আমন্ত্রণ, জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিকে দিকে বিতরণ করিয়া দিবার জন্য কর তাহাদের কাছে অনুনয়। অন্ন, বায়ু, জল, আলো, স্বাস্থ্য, শক্তি, সুখ ও জ্ঞান জগতের সকলের মধ্যে হউক সমভাবে বণ্টিত। একটী প্রাণীও যেন ইহা হইতে বঞ্চিত না থাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৯ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। দুই একটা বিষয়ে পরীক্ষা ভাল দেও নাই বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু তাহার

জন্য উদ্বিগ্ন হইবে কেন? সাফল্য বৈফল্য মনুষ্য-জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস। সফল হইবে, এই বিশ্বাসই অন্তরে গভীর ভাবে পোষণ কর। বৃথা অন্তরে দুশ্চিন্তা পোষণ করিয়া লাভ কি?

পরীক্ষার ফল কবে বাহির হইবে, তাহার জন্য এখন কিন্তু পড়াশুনায় খতম দিয়া বসিও না। পরবর্ত্তী পড়াশুনায় তোমার যাহাতে দ্রুত অগ্রগতি ঘটিতে পারে, তাহার অনুকূল ভাবে নানা বিষয়ে নিয়ম করিয়া দৈনিক চারি ঘণ্টা করিয়া অধ্যয়ন করিতে থাক। পরীক্ষার পরে গা এলাইয়া দেওয়া অতি অবসাদাচ্ছন্ন ব্যক্তির লক্ষণ। পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার পরে দেশ-পর্য্যটন করে। ইহা দ্বারা বাহিরের জ্ঞান ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আসে। আমাদের দেশে নানা কারণে ইহা আপাততঃ ব্যাপক ভাবে সম্ভব নহে। কিন্তু কোনও না কোন প্রকারে নূতনতর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা একান্তই সঙ্গত। তোমারই সমবয়সী দুই তিন হাজার কুমারী মেয়ে তোমার সহরটার মধ্যেই আছে। ইহাদের দুই তৃতীয়াংশ কোনও স্কুলে বা কলেজে পড়ে না। জ্ঞান ও শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার জন্য ইহাদের মধ্যে অনেকে সত্য সত্যই আকুলা। আক্ষরিক শিক্ষা ইহাদের দিতে পার আর না পার, প্রত্যহ পাড়ায় পাড়ায় গিয়া সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের নিয়মিত ভাবে শুনাইতে আরম্ভ করিতে পার। ধূপধূনার সুগন্ধের মধ্য দিয়া, অখণ্ড-স্তোত্রের সুমধুর ধ্বনির মধ্য দিয়া পুণ্যময় একটী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পাঠ-কার্য্য আরম্ভ করিবে। প্রথম দুই চারি দিন হয়ত লোক কম হইবে। কিন্তু তুমি যদি নিজের নিষ্ঠা

নিজে না ভাঙ্গ এবং প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠের জন্য যাইতে থাক, তাহা হইলে দিন দশেক পরেই দেখিবে যে, কেবল কুমারী মেয়েরা নহে, সধবা-বিধবা-নির্ব্বিশেষে সকল মহিলারাই আসিতেছেন। ভাল কাজ আরম্ভ করাটাই কঠিন কিন্তু দিনের পর দিন লাগিয়া থাকিলে ক্রমশঃ তাহার সফলতা অতি ব্যাপক ভাবে আসিতে থাকে।

এই যে নিত্য নূতন ভক্তিপ্রাণ মহিলাদের সহিত তোমার পরিচয় হইতে থাকিবে, ইহার ফলেও দেশ-ভ্রমণের ন্যায়ই নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসিতে থাকিবে। এক একটা মানুষের জীবনকে জানিও এক একটা মহাদেশের ইতিহাসের মতন। সচ্চিন্তা সদ্‌ভাব নিয়া যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়া একদিকে যেমন অনেক দুঃখীর অকল্পনীয় দুঃখের সহিত তোমার পরিচয় হইবে, তেমন দেখিও, কত কত ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, স্নেহ ও প্রেমের অপার্থিব দৃষ্টান্ত সমূহ কুড়াইয়া পাইবে। যাহাদিগকে আমরা অত্যন্ত তুচ্ছ বা নগণ্য জ্ঞান করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের কল্পনাশক্তির অনেক ঊর্দ্ধে নিজ নিজ সঙ্গোপন মহত্ত্ব নিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইঁহাদের আত্মপ্রচার নাই বলিয়া জগৎ ইঁহাদিগকে চিনে না!

বিশ্বাস নিয়া, প্রেম নিয়া, শ্রদ্ধা নিয়া ইঁহাদের মধ্যে যাইও। দেখিও, বিশ্বাস, প্রেম আর শ্রদ্ধারই ফসল ফলিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

৯ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও সান্ত্বনা জানিও। পিতৃবিয়োগে তুমি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছ কিন্তু মা জন্ম আর মৃত্যু উভয়ই ত' সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। ভগবান যখন তোমাকে বা আমাকে এই পৃথিবী হইতে টানিয়া নিয়া যাইবেন, তখন কি আমরা প্রতিবাদ করিব? মরণ ত' নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া নয়, মৃত্যু ত' দেহান্তর আশ্রয় বা ব্রহ্মসমাধি লাভ। ভগবানের সহিত মিলিয়া যাওয়ার মত শ্লাঘ্য সুখ আর কি আছে? যাঁর কাছ হইতে অসিয়াছিলেন, তোমার বাবা তাঁর কাছেই চলিয়া গিয়াছেন। সংসারের রোগ-শোক আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তিনি নিত্যানন্দধামে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি শ্রীভগবানের ক্রোড়দেশে আশ্রয় পাইয়াছেন। তাঁর জন্য আবার শোক করিবে কেন?

তথাপি রক্তমাংসের স্বভাবে শোক আসে। কিন্তু সেই শোক-প্রশমনের সাত্ত্বিক পন্থাও আছে। তুমি অবিলম্বে সমাজ-সেবায় লাগিয়া যাও। জীবের সেবায় নামিলে মনের সঙ্কীর্ণতা নাশ পায়। তখন নিজেকে কেবল একটা মাত্র সংসারের বা পরিবারের প্রতিনিধি বলিয়া ভাবিতে কুণ্ঠা আসে। জীবের সেবায় নামিলে বিশ্বের সকলের সহিত কুটুম্বিতা-বোধ জাগিয়া ওঠে। তখন প্রতিজনের দুঃখ-কষ্টে মন একদিকে উদাস এবং অন্যদিকে করুণ-রসাশ্রিত হইয়া ওঠে। ইহার ফলে নিজের ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ জগদ্বাসী সকলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া

গিয়া নুনের পুতুলের সমুদ্রের জলে আপন হারাইয়া যাওয়ার মত একেবারে বিলীন হইয়া যায়। জীবকে, সমাজকে, জগৎকে সেবা করিবার ভিতরে সর্ব্ব-শোকহর এক মহৌষধ আছে।

অবশ্য, শোক-তাপ থাকুক আর না থাকুক, তোমাদের দীক্ষালব্ধ সাধনার মধ্যেই এই বাধ্যবাধকতা রহিয়া গিয়াছে যে, তোমরা প্রতিজনে জগন্মঙ্গল কার্য্যের জন্য দেহ-মন-প্রাণ-সমর্পণ করিবে। তোমাদের সেই দায়িত্ব ত' বৈধ ভাবে তোমরা একজনেও এড়াইয়া যাইতে পার না। অথচ এতকাল ধরিয়া দৈনিক উপাসনা-কালে "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি।" এই সঙ্কল্প-মন্ত্র নিয়মিত মনন করিয়া যাইতেছ। যাহা এতদিন ছিল শুধু মনন, তাহাকে কর্ম্মে রূপায়িত করিতে হইবে। তোমার প্রতিটি পরমার্থ-ভগিনীকে ডাকিয়া আনিয়া বল,—"এতকাল আমরা উল্লেখযোগ্য ভাবে কোনও পরোপকারেই আসি নাই, এখন আমাদিগকে সত্য সত্য হাতে নাতে কাজ করিয়া দেখাইতে হইবে যে, আমরা অনেক পরোপকার করিতে পারি।" প্রত্যেকের অন্তরে উদ্দীপ্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, তোমাদের কাহারও জীবনই কেবল ব্যক্তিগত সুখ, ব্যক্তিগত উন্নতি বা ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য নহে। তোমাদের প্রতিজনকেই জগতের কল্যাণকর নানা কার্য্যে হস্ত-সংযোগ করিতে হইবে এবং তাহা তোমরা নিজ নিজ নেতৃত্ব-কর্ত্তৃত্ব-নাম-যশ প্রতিষ্ঠার লোভে করিবে না, করিবে নিজেদের অস্তিত্ব সার্থক করিবার জন্য। যাহা বহুবার করিতে চাহিয়াছ কিন্তু কর নাই, প্রতি জনেই তোমরা আগ বাড়াইয়া সেই মঙ্গল-কার্য্যগুলিতে হাত দিতে সুরু কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

কলিকাতা
১০ই বৈশাখ, ১৩৬৫

হরি-ওঁ

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা পাইলাম। আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও।

আশিস-নির্ম্মাল্য গ্রহণের পর হইতেই একমাত্র তাহারই শক্তিতে তোমার এতদিনের কঠিন রোগ ক্রমশঃ কমিতেছে এবং শরীরের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতেছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বিশ্বাস এক অমোঘ ঔষধ। বিশ্বাস এক অব্যর্থ জীবনীয় রসায়ন। তোমার বিশ্বাসের জয়-জয়কার দেই। যে নির্ম্মাল্যে, যে অমৃতে অন্তরের গভীর বিশ্বাস রাখিয়াছ, তাহা ত' ব্যর্থ হইতে পারে না।

প্রাচীন ভারত নিয়ত উপদেশ দিয়াছেন, "শান্ত হও, নিরুদ্বেগ হও, মনের অস্থিরতা, চঞ্চলতা, নিদারুণ আশঙ্কা-আতঙ্ক সব বর্জ্জন কর, বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, শান্ত হও, শান্তি পাও।" এই উপদেশ যাহারা পালন করিয়াছে, তাহারা দেহে মনে নীরোগ হইয়াছে, দীর্ঘায়ু হইয়াছে এবং অবিচল সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক কুশলও চূড়ান্তভাবে আহরণ করিয়াছে। সংসারের প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহাদের একটাও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকে নাই, জীবনের প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে তাহারা একজনও হারিয়া যায় নাই, সংসারের সঙ্গত সুখসমূহের ভোগ হইতে তাহারা একজনেও বঞ্চিত হয় নাই। তথাপি তাহারা সুদীর্ঘ পরমায়ু লইয়া সুস্থ শরীরে এই পৃথিবীতে বাস করিয়া গিয়াছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরাও এই একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যে, মানুষের অধিকাংশ রোগই তাহাদের মানসিক দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ হইতে জন্মিয়া থাকে এবং মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত ও উদ্বেগবর্জ্জিত করিতে পারিলে বিনা ঔষধে বা সামান্য ঔষধেই বহু রোগ সারিয়া যাইতে পারে। সিদ্ধান্তের দিক দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আজ আর অমিল নাই। কিন্তু মনকে শান্ত করিতে হইবে কি ভাবে, তাহার পন্থা লইয়া হয়ত গরমিল প্রচুর রহিয়া গিয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা মানুষের ভক্তি-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়-তার দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। ভক্তি আসিল ত' বিশ্বাস আসিতে দেরী হয় না। বিশ্বাস আসিল ত' ভক্তি উপজিতেও দেরী নাই। ভক্তি-বিশ্বাসের বলে মনে আসিল নির্ভর। নির্ভর আসিল ত' আর তার ডরই বা কি, ভয়ই বা কি?

তুমি ভক্তি-বিশ্বাস ও নির্ভরের বল পাইয়াছ। তাই একটুখানি আশিস-নির্ম্মাল্য তোমার সুকঠিন রোগ ক্রমশঃ সারাইয়া দিতেছে। এই বিশ্বাসে, এই নির্ভরে তুমি আরও দৃঢ় হও, আরও গভীর হও। তোমার বিশ্বাসের বল দেখিয়া চারিদিকের অবিশ্বাসীদের মনেও বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্ট হউক। তোমার বিশ্বাস চারিদিকের সহস্র অবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হউক।

তোমার বড় ছেলে এবার সপ্তম শ্রেণীতে উঠিল জানিয়া সুখী হইলাম। তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তোমার অন্তরের বিশ্বাস তোমার পুত্র দুটীর ভিতরেও সংক্রামিত হউক। দুর্ব্বলের অন্ধ বিশ্বাস নহে, জাগ্রত জীবন্ত প্রেরণা-সঞ্চারক সুদৃঢ় বিশ্বাস তোমার প্রত্যেকটী

পুত্র-কন্যার ভিতরে সঞ্চারিত হউক। তোমার ক্ষুদ্র সংসারখানা চারিদিকের পৃথিবী হইতে একেবারে আলাদা এমন একটী চমৎকার জগতে পরিণত হউক, যেখানে নিঃশ্বাসে বিশ্বাস, প্রশ্বাসে বিশ্বাস, জাগ্রতে বিশ্বাস, নিদ্রায় বিশ্বাস, কর্ম্মে বিশ্বাস, বিশ্রামে বিশ্বাস, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বিশ্বাস। বিশ্বাস তোমার মনের আরাম, দেহের বর্ম্ম, রূপের লাবণ্য এবং ভাষার সঙ্গীত হউক। বিশ্বাসমধুর সুন্দর সংসারে তুমি নিত্যসুখী পরিজনদের নিয়া এক অভিনব স্বর্গের রচনা কর।

কতকগুলি সংসার আছে, যেখানে পরিবারের কর্ত্তারাই নিজেদের অযৌক্তিক নির্ব্বুদ্ধিতা দ্বারা পুত্র-পরিজনদের মনে বৃথা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। যে স্থলে একটা সদ্বাক্য বিনা তর্কে মানিয়া লইবার মধ্যে যথেষ্ট কুশল রহিয়াছে, সে স্থলে তাহার ভাষার পরস্পর-বিরোধিতা, ভাবের অপারম্পর্য্য প্রভৃতির অনাবশ্যক অনুসন্ধানের দ্বারা সরল সহজ সাধারণ সত্যকে তর্কধূমে অচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা শুভ নহে। কারণ ইহার ফলে সংসারের প্রত্যেকটী পরিজনদের তার্কিক, দাম্ভিক ও গর্ব্বিত অপদার্থে পরিণত হইবার একটা প্রবল সম্ভাবনা আসিয়া যায়। মূর্খ পিতা ভাল কথাকে মন্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া নিজের পুত্রকে যে কত বড় একটা জীবন-সঙ্কটের মধ্যে ঠেলিয়া নিয়া ফেলিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখে না। এভাবে সরল বিশ্বাসপ্রবণ সুন্দর চিত্তগুলি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-পরায়ণ কুটিল হইয়া যাইতেছে। জগতে সরলতা যত কমিবে, শান্তিও তত কমিবে।

তুমি তোমার ক্ষুদ্র সংসারটুকুর চতুঃসীমায় এই সকল মূঢ় আচরণকে প্রবেশাধিকার দিও না। নিজেকে অত্যুচ্চ বা অসাধারণ

জ্ঞানী বলিয়া ভাবিতে বসিয়াই যে পরিবারের নেতা পরিবারস্থ সকলের মনে দাম্ভিক তার্কিকতার সৃষ্টি করে, এই কথাটী তুমি এবং তোমার স্বামী মনে রাখিও। সন্তানের শিক্ষার ভার তোমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হাতে দিয়া রাখিলেও তাহাদের প্রকৃত শিক্ষাটী যে তোমাদের কাছেই হইবে, এই সহজ সত্যটী একটী দিনের জন্যও ভুলিয়া যাইও না। যেই পিতা নিজে ঈশ্বর-সাধনা কিছুই করে না অথচ অন্যান্য সাধনশীল গুরুভ্রাতাদের প্রতি নানা উচ্চ উচ্চ আদেশ ঘোষণা করে, যেই মাতা ঠাকুর-ঘর হইতে বহুমূর্ত্তির অপসারণ করিতে সক্ষম হইতে পারা দূরে থাকুক, একটীর পর একটী করিয়া ছবি বা প্রতিমার সংখ্যা সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে কেবল বাড়াইয়াই চলিয়াছে, তাহারা যখন অন্যান্যদের মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য একনিষ্ঠা-সূচক ও একেশ্বরবাদ-মূলক মহাজ্ঞান-পূর্ণ নানা প্রকার উপদেশের ফুলঝুরি ফুটাইতে থাকে, তখন তাহারা যে প্রকারান্তরে নিজ পরিবারস্থ শিশুদের মনে দাম্ভিক কর্ত্তৃত্ববোধের ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেয়, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা কয়জনের আছে? পরিবারের তিনিই শ্রেষ্ঠ নেতা, যাহার বাক্যে, আচরণে এবং মননশীলতায় নিয়ত রহিয়াছে বিনয় এবং সত্যের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সহজে সমালোচক হয় না এবং সমালোচনায় কখনও প্রবৃত্ত হইলেও তাহার সমালোচনায় কোথাও কাহারও নিষ্ঠাচ্যুতি বা বিশ্বাসভঙ্গ ঘটে না।

তোমাদের গুরুভ্রাতা এবং গুরুভগিনীরা সংখ্যায় নিয়ত বাড়িয়া চলিয়াছেন কিন্তু শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে, বিনয়ে, নম্রতায় এবং অকপট সেবা-বুদ্ধিতে ত' তাঁহাদিগকে আনুপাতিক ভাবে বাড়িতে দেখা যাইতেছে

না। ইহার ভিতরে মহাকালের ইঙ্গিত রহিয়াছে। তোমাদের সঙ্ঘকে সাবধান হইতে হইবে। বিশ্বের সহিত পূর্ণ যোগ-সাধন ত' কখনও সফল হইতে পারে না, যদি তোমাদের বিশ্বাসে থাকে ঘাটতি! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১০ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা যাহাতে প্রতিজনে জগৎকল্যাণে নিয়োজিত হইতে পার, ইহাই ত' তোমাদের প্রার্থনা এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তজ্জন্য তোমাদের জগৎকল্যাণ-সম্পর্কিত বচনশীলতা কমাইয়া মননশীলতা বাড়াইতে হইবে। কথা যেখানে যত বেশী, কাজ সেখানে তত কম। কথার আবশ্যকতা নাই, তাহা নহে। আবশ্যকতা আছে বলিয়াই ত' কথার সৃষ্টি। কিন্তু কথার একটা বড় দোষ হইতেছে আত্মপ্রচার। বড় বড় কথা বলিলে শ্রোতারা বড় মানুষ বলিয়া বাহবা দেয়। এই লোভে লোকে অকারণে বড় বড় কথা বলে। বচনশীলতার এইটুকু দোষ। পুঞ্জীভূত মননশীলতার উপরে দাঁড়াইয়া আছে যে অল্প কয়েকটী সৎকথা, তাহাই বাস্তব রূপায়ণ পায় সহজে।

তোমার সকল ভ্রাতা ও ভগিনীরা যাহাতে উপাসনা-কালীন জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পটীর সাগ্রহ অনুশীলন করে, তদ্বিষয়ে তাহাদের স্মৃতি-শক্তিকে ও সাধনেচ্ছাকে নিয়ত জাগরূক রাখিবার জন্য একটা ধারাবাহিক চেষ্টার বড় প্রয়োজন। এই দিকে তোমরা কয়েকজনে একটু দৃষ্টি দিও। অধিকাংশেই উপাসনা-প্রণালীখানা পড়ে না। পড়িলেও অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করে না। তোমাদের উপাসনার পদ্ধতি যে সমগ্র মানব-জাতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিবার একটী অভাবনীয় আয়োজন, একথা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১০ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও অশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। পয়লা বৈশাখ তোমরা উৎসব করিয়াছ, প্রাণের আনন্দে স্তোত্র, কীর্ত্তন, উপাসনা, পাঠ ও প্রচারের মধ্য দিয়া অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মরণ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? ক্ষুদ্র একটা গ্রামে ছিলে, উৎসবের আনন্দ পাইতে না। এখন একটা কেন্দ্রীয় সহরে আসিয়া পড়িয়াছ, কিছুদিন পরে পরেই একটা না একটা উপলক্ষ্য করিয়া উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ

কর,—ইহাতে অন্তরের তৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছ। সত্যই ইহা এক তৃপ্তিপ্রদ অবস্থাই বটে। অমি ত' চাহি, তোমাদের প্রতিজনের জীবনের প্রতিটি দিন হউক উৎসবময়। দুঃখের শত নিষ্পেষণে যাহাদের জীবন-মুকুলবৃন্তেই শুকাইয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহাদের বৎসরের প্রতিটি দিনকে উৎসবমুখরিত করিবার জন্যই ত' আমার প্রাণের যত আকিঞ্চন। উৎসব তোমাদের হৃদয়ের উৎস-মুখ খুলিয়া দেউক।

কিন্তু জলের উৎস কখন হয় উৎসারিত? যখন সকল দিকের সকল জলকণা এক দিকে নেয় গতি আর নিম্নদিকে ধাবিত হইবার সকল ইচ্ছা পরিহার করিয়া ঊর্দ্ধে পাইতে চাহে বিস্তার। তোমরাও সকলে যখন মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহিবে, তখন দেখিও, শুধু মিলনের দ্বারাই উৎসব হইয়া যাইবে। বহিরঙ্গ নানা অনুষ্ঠান ছাড়াই উৎসব জমিতে পারে, যদি তোমাদের মিলন হয় ঊর্দ্ধমুখ লক্ষ্যে। যতবার পার মিলিত হও, যত অধিক পার মিলনের প্রকৃত লক্ষ্যকে স্থির রাখিবার চেষ্টা কর। ক্ষুদ্র পল্লী, বৃহৎ নগর, বিশাল জনপদ সকলই তোমাদের মিলনের যোগ্য ভূমি হউক।

বহুজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি ও তুচ্ছ তুচ্ছ সেবাকে একটী মুহূর্ত্তমধ্যে একটী স্থানে কেন্দ্রীকৃত করিয়া একটীর সহিত অপরটীর সামঞ্জস্য বিধান করিবার নাম মিলন। উৎসর্গ ছোট হইতে পারে কিন্তু প্রতিজনেই যেন তাহা করে। একজনও যেন একটুকু ত্যাগ হইতে নিজেদের বিযুক্ত না রাখে। মিলনের ইচ্ছা যেখানে সত্য, সেখানে এক কণা করিয়া হইলেও ত্যাগ স্বাভাবিক। মিলন যখন স্বভাবকে অতিক্রম

করিয়া চলে, তখন তাহাতে কপটতা আসে। উৎসবাদিতে তোমরা যখন মিলিত হও, তখন তাহাদেরই ঔদ্ধত্য ও দুর্বিনয় দেখা যায় অত্যধিক, যাহারা ত্যাগ-স্বীকার করে নাই কিছুই কিন্তু বুদ্ধিদাতা গণেশকেও অতিক্রম করিয়া যায় নিজ নিজ মস্তিষ্কের দ্রুত ক্রিয়াশীলতায়। সূর্য্যোদয়ের সহিত অন্ধকারাপসরণের যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, প্রকৃত মিলন-প্রয়াসের সহিত ত্যাগশীলতার সম্পর্ক ততটাই ঘনিষ্ঠ। সূর্য্য উঠিল অথচ অন্ধকার দূর হইল না, এমন যদি ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে, তোমার চখের ভ্রম হইয়াছে, আসলে সূর্য্য ওঠেই নাই, তুমি মরীচিকা দেখিয়াছ। উৎসব-প্রাঙ্গণে মিলিত হইলে অথচ তোমাদের ত্যাগের উৎস-মুখ কঠিন পাষাণে চাপা রহিল, এমন ঘটনা ঘটিলে বলিতে হইবে যে, মিলনের আগ্রহ তোমাদের ছিল না, তোমরা দেখিতে বা দেখাইতে আসিয়াছিলে শুধু তামাসা।

তোমাদের আমি অভিক্ষার বাণী শুনাইয়াছি, নিজেও অভিক্ষাকে ব্রতরূপে পালন করিতে আপ্রাণ প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছি আকৈশোর। সুতরাং তোমাদের উৎসবে অভিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হইবে। লোকের দুয়ারে দুয়ারে যাচিয়া চাহিয়া তোমরা সাহায্য সংগ্রহ করিতে গেলে তাহা তোমাদের পক্ষে নিন্দার না হইতে পারে কিন্তু প্রশংসার হইবে না। বহুজনকে লইয়া কোনও সদনুষ্ঠান করিতে গেলে প্রায় সর্ব্বত্রই সকলে সহস্র জনের সহায়তা প্রার্থনা করে, অনেক স্থলে তাহাদের প্রার্থনা-পূরণও ঘটে এবং তাহারই বলে তাহারা নিজ নিজ অভীপ্সিত মিলনোৎসব সমাপন করিয়া থাকে। ইহার জন্য

তাহাদিগকে নিন্দা করিবার কারণ কিছুই দেখি না। কিন্তু তোমাদের মিলনেচ্ছাকে আমি এমন এক স্বভাব-স্ফূর্ত্ত দিব্য মূরতিতে দেখিতে চাহি, যেখানে যাচিবার চাহিবার বহির্ম্মুখ চেষ্টা থাকিবে না, প্রত্যেকের প্রাণের অকপট অনুরাগ ত্যাগে রূপান্তরিত হইয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত আদর্শের পায়ে ঝরিয়া পড়িবে। আজ তোমরা হয়ত দেখিতে পাইতেছ যে, যাহারা চাহে, মাত্র তাহারাই পায়, যাহারা চাহে না, তাহারা পায় না কিন্তু একদিন এই তোমরাই দেখিতে পাইবে যে, সত্য ও সাত্ত্বিক মিলনেচ্ছা মানুষের মনে জাগ্রত হইবার ফলে না চাহিয়াও পাওয়া যায়। চাহিবার যদি শক্তি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে জানিও যে, না-চাহিবার শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী। মিলনেচ্ছা সুপ্রবল ও সুসাত্ত্বিক না হইলে না-চাহিবার শক্তির প্রকাশ হয় না।

তোমাদিগকে কখনও কখনও পরমুখাপেক্ষী হইতে হইতেছে, ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। জগতে কেহই তোমাদের পর নহে, সকলেই আপনার আপন। সুতরাং পরমুখাপেক্ষিতা তখন কোনও দোষের ব্যাপার হইয়া যায় না, যখন সকলকে আপন বলিয়া মানা যায়, জানা যায়, বুঝা যায়, চেনা যায়। কেহ কেহ সকলের সহিত আপনত্ব-বোধকে পাকা করিবার জন্যই লোকের দুয়ারে প্রার্থনার পাত্র নিয়া উপস্থিত হন। "এ ত' আপনাদেরই কাজ, আপনাদের কাজেই আপনাদিগকে ডাকিতেছি,—অর্থের প্রয়োজন, বিত্তের প্রয়োজন, অন্নের প্রয়োজন, ভূমির প্রয়োজন,—এ প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়া নিজেদের কাজ নিজেরা সুসম্পন্ন করুন,"—এ কথা যদি বলিবার উপযুক্ত মনোভঙ্গিমা নিয়া

বলা যায়, তাহা হইলে কোনও কোনও স্থলে বক্তার অন্তরে দাতাদের প্রতি আপনত্ব-বোধ জাগা বিচিত্র নহে, কোনও কোনও স্থলে দানগ্রহীতার প্রতিও দাতার আপনত্ব-বোধ আসিতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও অসম্ভব নহে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান চারিদিকে হাটিয়া-খাটিয়া উৎসবাদির জন্য দান সংগ্রহ করিলেও তাহা নিন্দনীয় হয় না। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের অন্তরের মিলনেচ্ছাকে এমন সত্য করিতে পার যে, ইহার স্বাভাবিক পরিণতি আপনা-আপনি আত্মপ্রকাশ করিবেই, তবে তোমাদের আবার কোনও কিছুর জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে কেন? তোমরা কয়েক জন বা কয়েক শত নরনারী যে একত্র মিলিত হইতেছ, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি হইয়া থাকে বিশ্বের সকল নরনারীর সহিত তোমাদের সামীপ্য-প্রতিষ্ঠা, তাহা হইলে তোমাদের অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক সরসতাই কেন সমাজের সর্ব্বস্তরের সকল লোককে আকর্ষণ করিবে না? এমন দু'-একটা প্রতিষ্ঠান ত' তোমাদের ওখানেই আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের অনুষ্ঠান-মধ্যে তোমাদের কার্য্যকর উপস্থিতি চাহেন না অথচ তোমাদেরই কাছ হইতে অবাধে সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা-সংগ্রহ করিয়া যাইতেছেন, নিজেদের উৎসবের জন্য চাঁদা প্রায় জোর করিয়া তুলিয়া নিয়া গিয়াছেন। যখন তোমাদের ঘরে ঘরে তাঁহারা পাঁচ, দশ, পঁচিশ টাকা করিয়া চাঁদা তুলিতেছিলেন, তখন এ কথা তাঁহাদের কাহারও অজানা ছিল না যে, তোমাদের বাবামণি তোমাদেরই একজনের গৃহে সশরীরে দশ এগার দিন ধরিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া একটী লোকও

আমাকে বলেন নাই যে, আমি যেন তাঁহাদের উৎসবে যোগদান করি। আকারে ইঙ্গিতেও কোনও দিক হইতে সামান্য একটা আমন্ত্রণের আমেজ আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। রাস্তায় বেড়াইতে সেই প্রতিষ্ঠানের অনুরক্তদের একজনের চখে-মুখেও আমি এক কণা আহবানের চিহ্ন দেখি নাই। যে দিকে তাকাইয়াছি, দেখিয়াছি কেবল গুটানো আস্তিন, ক্রুদ্ধ চক্ষু, রুষ্ট মুখ। তবু ত' আমি তাহাদের উৎসব-প্রাঙ্গণে দুইটী মাইল পায়ে হাটিয়া গিয়াছিলাম, ঘড়ি ধরিয়া বারোটী মিনিট সময় শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের গায়ক ও বক্তাদের গান ও বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। মানুষ সেখানে মিলিয়াছে, কিছু লোক সেখানে মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়া বসিয়াছে, নানা দিক হইতে সমাগত সকলের এই সাত্ত্বিক আন্তরিকতাটুকুর মধ্য হইতে আমি আমার মনের মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। যাঁহারা উৎসব মানাইয়াছেন, তাঁহাদের মনোভঙ্গী আমার প্রতি কিম্বিধ হইতে পারে, তাহা আমি জানিতে চেষ্টা করি নাই। যাঁহারা আমাকে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় এই উৎসবের স্থানে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও আমি রাখি নাই। রাস্তায় যখন গর্জ্জনা ছম্প্সত্তস্ত-ত্রহ্মান্দ্রস্নব্দজগ্ন বাজাইয়া সর্ব্বসাধারণকে যোগদান করিতে ডাকা হইয়াছে, তখন অন্য দশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আমাকে পৃথক্ আমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিয়া আমার অভিমান করিবার কি আছে? রাস্তায় ঢোল পিটাইয়া বলা হইয়াছে, তাহাতেই আমার আমন্ত্রণ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিতে অধিকারী। যাঁহারা উৎসবের উদ্যোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনোভাব অপেক্ষা যাঁহারা

মিলনের ডাক শুনিয়া সাত্ত্বিক মনোভাব নিয়া এক স্থানে একত্র হইবেন, তাঁহাদের চিত্ত-সারস্যের ক্ষণিক স্পর্শলোভ আমাকে প্রবলতর ভাবে টানিয়া নিয়াছিল। আর একটী আকর্ষণও টানিয়াছিল,—তাহা মহাপুরুষের পুণ্য-স্মৃতি। আমি কাহারও শিষ্য-প্রশিষ্যদের শিষ্য নহি বলিয়া মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিব না?

তোমাদের ঘরে ঘরে ইঁহারা চাঁদা তুলিয়াছেন এবং মনে মনে আমাকে ভাবিয়াছেন অবাঞ্ছিত। সুতরাং তোমরাও যে ছিলে বাঞ্ছিত, ইহা ত' মনে করিবার কোনও যুক্তি নাই। তথাপি কতকগুলি মিলনেচ্ছু মন ইঁহাদের আহবানে একত্র হইয়াছে দেখিয়া এই মিলনকে অন্তরের অর্ঘ্য দিতে আমাকে ছুটিয়া যাইতে হইয়াছিল। তোমরা যদি ঘরে ঘরে চাঁদা তুলিবার চেষ্টা না কর অথচ প্রতি গৃহের প্রতি নরনারীর সহিত অন্তরের সামীপ্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হও একান্ত লালায়িত, তাহা হইলে তোমাদের এই নিঃস্বার্থ শুভেচ্ছা বিশ্বের সকল মানুষকে টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া নিয়া আসিবে। তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করিও। আমি উপলব্ধ সত্য প্রকাশ করিতেছি, তৈরী করা গল্প বলিতেছি না। হইলই বা তোমাদের উৎসবের মণ্ডপ-সজ্জা একটু কম শৈল্পিক, হইলই বা তোমাদের উৎসবের বাহ্য আড়ম্বর কিছুটা কম চিক্কণ, হইলই বা তোমাদের অন্যান্য আয়োজন একটু কম মনোহারী, কিন্তু অন্তরের বিনয় আর আগ্রহের অকপটতা, ভাবের সারল্য আর প্রেমের প্রাবল্য সেই ত্রুটি, সেই স্বল্পতার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে। প্রেমে তোমরা হও ভরপূর। প্রেমই হোক তোমাদের

জীবন ও লক্ষণ, প্রেমই হউক তোমাদের স্বভাব ও পরিণতি। প্রেম-সাগরের ডুবুরী হইয়া পরমানন্দে প্রেম-মুকুতা আহরণ করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের সকলের গলায় সাদরে তাহা পরাইয়া দাও। তোমাদের লক্ষ্য হউক উদার, সর্ব্বালিঙ্গনকারী, বিশ্বতোমুখ। একটী মানুষের মধ্যে যে নিখিল বিশ্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, এই কথাটী বিশ্বাস করিয়া তোমরা প্রতিটী মানবের প্রতি স্নেহশ্রদ্ধার দৃষ্টি কর প্রসারিত। চাঁদা আদায় করিয়া লোকের আপন হইতে চাহিও না, প্রেমদান করিয়া আপন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১১ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ-জাল ঘিরিয়া ধরিয়াছে বলিয়াই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িও না। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া মনের উদ্বেগ শান্ত কর। এমন মানুষ পৃথিবীতে কোথায় আছে যে, কখনও বিপদে পড়ে নাই? অনেক সময়ে বিপদ-আপদ আমাদের পরোক্ষ মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। ইহা প্রায় প্রতিদিনই ত' প্রত্যক্ষ করিতেছ। পুত্রকন্যার

আচরণ পিতামাতাকে সমাজের মধ্যে সম্মানিত এবং অসম্মানিত করিয়া থাকে। কোন্ পুত্রের আচরণ কি হইবে, কোন্ কন্যাই বা কখন কি করিবে, তাহার সমস্ত দায়িত্ব কি পিতামাতার পক্ষে বহন করা সম্ভব? অনেক সময়ে মিথ্যা অপবাদও সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই মিথ্যাকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বা রাজদ্বারে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিতও হইতে দেখা যায়। কিন্তু উহাই কি তোমার বা আমার বিচারবুদ্ধি একেবারে ঘোলাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে? বিপত্তি ঘটিয়াছে, অপবাদ আসিয়াছে, লোকলজ্জার সৃষ্টি হইয়াছে—সবই সত্য। কিন্তু আমার বা তোমার চিত্তস্থৈর্য্য নাশ হইয়াছে, ইহা কেন সত্য হইবে? কেন আমরা জনমত, রাজদণ্ড, সামাজিক প্রতিপত্তির হানি কিম্বা যে-কোনও অপ্রত্যাশিত সঙ্কট অতিক্রম করিয়া সুস্থ, সবল, সুদৃঢ় মেরুদণ্ড লইয়া সোজা হইয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইব না?

বিপদে যখন বিহ্বল হই, বুঝিতে হইবে পরমেশ্বরে আমাদের বিশ্বাস কমিয়াছে। তিনি কেবল সম্পদই দিবেন, বিপদের স্বাদ আমরা পাইব না, তিনি কেবল সুখই দিবেন, দুঃখ আমাদের কাছে আসিবে না, এই আব্দার আমরা কেন করিব? যিনি আলোক দিয়াছেন, তিনি অন্ধকারের মধ্যেও যে আছেন, যিনি দিয়াছেন বর্ষার সুশীতল বারিধারা, বজ্র-বিদ্যুৎ যে তাঁহারই সৃষ্টি, একথা কেন আমরা ভুলিয়া যাই? তাঁহাতে যদি থাকে প্রেম, তাহা হইলে তাঁহার দেওয়া কোন্ জিনিষটি হইবে আমাদের নিকট অনাদরের বা উপেক্ষার?

তোমার পুত্র মিথ্যা অপবাদ বহিয়া যে নিদারুণ সঙ্কটজনক

পরিস্থিতিতে উপনীত হইয়াছে, ভগবৎ-কৃপায় যে-কোনও মুহূর্ত্তে তাহার পূর্ণ অবসান ঘটিতে পারে, এই বিশ্বাস কেন তুমি করিতে পারিতেছ না? আর যদিই তাহাকে মিথ্যার খড়্গেই ছিন্নশির হইতে হয়, তবে তাহাও ত' ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হইবে। মিথ্যাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য যোগ্য চেষ্টা তোমরা করিয়াছ। সে চেষ্টা না করিলে তোমাদের পক্ষে অন্যায় হইত। সে চেষ্টা সফলও হইবে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সেজন্য তোমাদের ত' কোন দায়িত্ব নাই, দোষও নাই। পরমেশ্বর যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহা করিবেন। তাঁহাকে যদি ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার প্রদত্ত কণ্টক-শয্যাকে কুসুম-শয়ন বলিয়া কেন মানিয়া লইবে না? অধীর হইও না, বিহবল হইও না। ভগবানে সমর্পণ কর অন্তরের প্রেম। তাহা হইতেই আসিবে আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভর এবং শান্তি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও অশিস জানিও। তোমরা এই কয়দিনে যে সকল পবিত্র অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার বিবরণ পাইয়া সুখী

হইয়াছি। বিজিগীষা নহে, ভালবাসাকে বিশ্বতোমুখ বিস্তার দিবার জন্যই তোমাদের অনুষ্ঠান। যাহারা সমভাবের ভাবুক রহিয়াছ, নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহারা প্রত্যেকে অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিতে থাক। তাহা হইলে ইহারই ফলে তাঁহারাও আসিয়া তোমাদের সহিত এক সূতায় গাঁথা মালার প্রফুল্লানন পুষ্প হইবেন, আজ যাঁহারা তোমাদিগকে শত্রু বলিয়া ভাবেন কিম্বা কাল যাঁহাদিগকে তোমরা নানা বিরুদ্ধ কর্ম্মে লিপ্ত হইতে, দেখিয়াছ। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিও, তোমাদের জগজ্জয় প্রেমের জয়।

উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কাহারা কাহারা আসিল, তাহার তালিকা রক্ষা এক হিসাবে খুবই ভাল কাজ। আজ যাহারা সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে আগ্রহ দেখাইতেছে, কাল তাহাদের অনেকের উপরই বৃহৎ কর্ম্মের ভার দিবার সাহস তোমরা পাইবে। সুতরাং এই তালিকা যত্ন করিয়া রক্ষা কর। উপাসনার শেষে তালিকা করিতে গেলে কিছুটা হট্টগোল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উপাসনার পরে প্রত্যেকে অন্তরের প্রশান্ত ভাব লইয়াই গৃহে ফিরুক, ইহাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং মণ্ডপ-প্রবেশ-কালেই সকলের নাম টুকিয়া রাখা ভাল কথা। প্রবেশ-দুয়ারে যদি একটা খাতা থাকে, তাহা হইলে উহাতেই ত' প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম লিখিয়া ঢুকিতে পারেন। ইহা খুব কঠিন কাজ নহে এবং সামান্য চেষ্টাতেই ইহার শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব।

বর্ত্তমানে এক একটা উপাসনায় পঁচাত্তর ছিয়াত্তর জন করিয়া উপাসক উপাসিকা যোগ দিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু তোমাদের যাহা জনবল, তাহাতে কম করিয়া ধরিলেও দেড়শত হইতে

দুইশত জনের উপাসনায় যোগদান বাঞ্ছনীয়। বৃদ্ধ, রুগ্ন, জরুরী কাজে অপ্রত্যাশিতভাবে আটক লোকদের বাদ দিয়াই আমি সংখ্যা ধরিলাম। তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া দেখ যে, আমি অসঙ্গত আশা করি নাই।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের ভাবের অনুকূল সঙ্গীত এবং ভাষণাদি রাখিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। উহাতে অখণ্ড-সংহিতার নির্ব্বাচিত অংশ পাঠের জন্যও দশ মিনিট সময় রাখা উচিত। তোমাদের প্রত্যেকটী মাঙ্গলিক কার্য্যের সহিত অখণ্ড-সংহিতার অবিচ্ছেদ্য যোগ থাকা অবশ্য প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও অশিস জানিও। তোমার নিকট হইতে পত্র প্রত্যাশা করিতেছিলাম। তাহার মানে এই নয় যে, কোথায় তোমাদের কাহার সহিত কোন্ বিষয়ে মতানৈক্য হইবে, তাহার বিবরণ চাহিতেছিলাম। কোথায় কোথায় মিলনের মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় কে গাহিয়াছে মিলনের গীতি, কোথায় সহস্র বিপরীত অবস্থার

মধ্যেও একটি দুইটি দুর্ল্লভ মানবাত্মা মিলনের দুর্নিবার আকর্ষণে দুর-দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া একত্র হইয়াছে, ইহাই আমি শুনিতে চাহিয়াছিলাম।

কতকগুলি বিপরীত অবস্থার মধ্য দিয়া তোমাদের বিগত কয় মাসের কর্ম্মেতিহাস রচিত হইয়াছে। যদিও তাহাতে ব্যর্থতার মর্ম্মন্তুদ কাহিনীও কম নাই তথাপি উহা তোমাদের অগ্রগমনেরই ইতিহাস। হাজার মাইল বেগে ঝড়ের বাতাস আসিয়াছিল, এক হাজার এক মাইল বেগে তোমরা তাহার বিরুদ্ধে আগাইয়াছ। কয়েক মাসের পরিশ্রমে মোট অগ্রগমন মাত্র এক মাইল হইলেও, ইহা পশ্চাদপসরণের অপেক্ষা সহস্র গুণ গৌরবজনক। এই ক্ষুদ্র অগ্রগতিটুকু তোমাদের পৌরুষের চিহ্ন। অল্প আগাইয়াছ বলিয়া তোমরা তিরস্কার-ভাজন নহ, যদিও অগ্রগতি অধিক হইলে পুরস্কার তোমাদের প্রাপ্য হইত।

যাহারা দোষদর্শী অথবা অত্যন্ত দরদী, তাহারা তোমাদের স্বল্প অগ্রগতিকে তৃপ্তির দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না। দোষদর্শীরা তোমাদিগকে গালি দিবার জন্য তোমাদের সাফল্যের অল্পতাকে মূলধন করিয়াছে; আর তোমাদের হিতৈষীরা এই হতবুদ্ধিকর অ-বিজয়ের কারণানুসন্ধান করিয়া কেবলই বুক চাপড়াইতেছে যে, আগে হইতে কেন তাহারা আরও সজাগ আরও সক্রিয় হইল না। কিন্তু যে-কোনও অবস্থায় এক তিল হইলেও তোমরা আগাইয়াছ—এই সত্যকে অস্বীকার করিবে কে? আর একটী জায়গায়ও তোমাদের একটি বিরাট জিত হইয়াছে। তাহা তোমাদের সংগ্রামের

দীর্ঘকালব্যাপিতা। দু' ঘণ্টায় যে ঝড় থামিয়া যায়, সেই ঝড়ে ঘরের খুঁটি ধরিয়া রাখা যত সহজ, পক্ষ-কালব্যাপী তূর্ণডের (Tornedo) মুখে ঘরের চালা টানিয়া ধরিয়া রাখিবার ভিতর যোগ্যতা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক আছে। এই যোগ্যতাটাও তোমাদের একটা জিত, যদিও বলা ভুল হইবে না যে, আর দুই দিন যুদ্ধ চলিলে তোমরা কুপোকাৎ হইতে। সম্বৎসরব্যাপী ঝড়ের মাঝেও ঘরের চালা ধরিয়া থাকার যোগ্যতা তোমাদের প্রয়োজন ছিল।

যে যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল অথচ যাহা তোমাদের ছিল না, তাহা আজ এখনই সঞ্চয় করিতে হইবে। ঝড়ের বেগে প্রতিপক্ষের অনেক মেঘ শীলাখণ্ড হইয়া ভূতলে নামিয়াছে, এখন উহা কুড়াইয়া গামছায় মুঠি বাঁধিয়া ঘরের চালে লটকাইয়া তাহার সুন্দর শোভা দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিবার যোগ্যতা ক্ষুদ্র শিশুদেরও আছে। ঝড়ের সময় যাহারা তোমাদের ঘরের চালা ধরে নাই, খুঁটির গোড়ায় দাঁড়ায় নাই, সেই দুর্ব্বল অবোধ শিশুগুলিকে ভূতলে পতিত আকাশ হইতে খণ্ডিত অভ্রগুলিকে কুড়াইবার কাজে লাগাইয়া দাও। ঝড়ের সময়ে যে আকাশের মেঘ ছিল তোমার বিপক্ষে, তাহারই অংশগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবার পরে হইয়াছে তোমাদের একান্ত আপন। ঝড় থামিলে সাধারণ বালক-বালিকারাও কাঁচা আম কুড়াইতে যায়, তোমরা তোমাদের শিশুদের বসিয়া থাকিতে দিবে কেন?

যতজন লম্ফঝম্ফ দিয়া, লাঠি-সড়কি হাতে লইয়া, কোমরে

মাল-কোচা বাঁধিয়া রাস্তায় নামিয়াছিল, তাহারা সকলেই এখনও তোমাদের প্রতিপক্ষই রইয়া গিয়াছে, এমন ভ্রান্ত ধারণা মনের মধ্যে রাখিও না। নিজেদের যুদ্ধোদ্যমে উৎসাহের আতিশয্য ফলাইয়া ইহারা কেবল ক্লান্তই হয় নাই, পরন্তু কেহ কেহ নিজেদিগকে বিবেকের নিকট অপরাধী বলিয়াও অনুভব করিতেছে। ইহাদের বিবেক-দংশন তাজা থাকিতে থাকিতে যদি ইহাদের নিকট তোমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, আদর্শ ও মিলনের বাণী লইয়া অগ্রসর হইতে পার, অনেকের মালকোচা খসিয়া যাইবে, অনেকের কোমরের গামছা গলদেশে শুভ্র উত্তরীয়রূপে শোভা পাইবে, অনেকের রক্তচক্ষু ধ্যানস্তিমিত যোগনেত্রে পরিণত হইবে, অনেকের উদ্যত দণ্ড পূজার পুষ্পাঞ্জলিতে রূপান্তরিত হইবে। যেখানে এক হাজার এক মাইল আগাইতে পারিতে, সেখানে তোমরা এক মাইল মাত্র আগাইয়াছ কিন্তু ইহারা যে মনের দুঃখে মরিয়া যাইতেছে, তোমাদের শুভযাত্রা একেবারে বিফল করিয়া দিতে পারিল না বলিয়া। একটা মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ঈর্ষ্যার ছলনায় ভুলিয়া পাপের মরীচিকায় প্ররোচিত হইয়া ইহারা ঘরে ঘরে যাইয়া কত মিথ্যা কথা বলিয়াছে, কত অপবাদ রটাইয়াছে, কত অপকথা রচিয়াছে, কতজনকে কত দিয়াছে ধাপ্পা, কোথাও কোথাও করিয়াছে ভয়-প্রদর্শন। ইহারা যাহা চাহিয়াছিল, এত করিয়াও তাহা করিতে পারিল না। আর তোমরা যাহা চাহিয়াছিলে, তাহার কিছু না কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছ। উভয় পক্ষের প্রাপ্তির মধ্যে এই যে দুস্তর ব্যবধান, তাহা অনেকের ধর্ম্মান্ধতা

ঘুচাইয়াছে। তোমরা আত্মবিশ্বাস সহকারে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর। তোমাদের এইবার ঘর ছাইবার সময় হইয়াছে, বহু নিরপেক্ষ নরনারীর চক্ষে মিথ্যা-প্রচারকদিগের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। বহু কুসংস্কার-বর্জ্জি ত সজ্জন ব্যক্তি অকারণ বিরোধিতার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়াছে এবং যেই জনমত মাত্র কয়টি দিন পূর্ব্বে প্রবলভাবে তোমাদের বিরোধী ছিল বলিয়া তোমরা মনে করিতেছিলে, সেই জনমত, তোমাদের চেষ্টায় নহে, ইহাদেরই অপচেষ্টার ফলে তোমাদের অনুকূল হইয়াছে। এই দামী কথাটা তোমরা একজনেও অবিশ্বাস করিও না। ধাপ্পাবাজী দিয়া, ধোঁকা মারিয়া, চালবাজি খেলাইয়া বিশ্বের সকল মানুষকে চিরকাল কেহ ভেড়া বানাইয়া রাখিতে পারে না।

সুতরাং সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা রচনা করিয়া অবিলম্বে তোমরা পুনরায় কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়। আগে যতখানি বাহুবল লইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে করিয়াছিলে সঞ্চরণ, এখন তাহার শতগুণ শক্তি লইয়া কাজে লাগ। আগে যাহারা আরামে বসিয়া রহিয়াছিল আর তামাসা দেখিতেছিল, এখন তাহাদিগকেও কাজে লাগাও। একজনকেও আর বসিয়া থাকিতে দিও না। তোমাদের সহিষ্ণু সংগ্রাম আকাশে বাতাসে তোমাদের বিজয়-ভেরী বাজাইতেছে। এ সময়ে কেন প্রত্যেকের অন্তরে আত্মপ্রত্যয় জাগিবে না?

তবে একদল লোক সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হইও। ইহারা মাথায় খুব ভারী, কথায় খুব দরাজ, প্রতিশ্রুতি মুক্তপ্রাণে, বড় বড়

বুদ্ধি আবিষ্কার করিতে পটু কিন্তু কাজের বেলায় গা বাঁচাইয়া চলে। ইহাদিগকে ডাকিবে না। স্বেচ্ছায় আসিলে অনাদর করিও না। কিন্তু ইহারা না আসিলে তোমাদের কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে, এই ভ্রান্তি মন হইতে দূর করিয়া দাও। সৎকর্ম্মের ইহারা অশুচি রাহু, সংঘশক্তির ইহারা অন্ধকারচারী ঘুণ। কথার দাপটে মহৎ কার্য্য সম্পাদন হয় না, সংঘের ঐক্য বাড়ে না, সর্ব্বসাধারণের সহিত আপনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। কথার ফুলঝুরি দিয়া গণ-নারায়ণের পূজা হয় না। অকপট সরল কর্ম্ম তোমাদের সহকর্ম্মীদের বিশেষত্ব হউক।

এ যাবৎ যত কিছুর অনুশীলন করিয়াছ, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম অনুশীলিত হইয়াছে প্রেম। ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ব-নেতৃত্বের দিকে প্রতিজনে যত লক্ষ্য দিয়াছ, তত লক্ষ্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবার দিকে দাও নাই। পরস্পর পরস্পরকে এখনও আপন বলিয়া চিন নাই। একে যখন অন্যের উচ্চারোহণের মই হয়, তখন আপনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। একে যখন অপরের পদোন্নতির সিঁড়ি হয়, তখন ভালবাসা জন্মিতে পারে না। প্রণাম নেওয়া আর প্রণাম করা, ইহাই যখন পরস্পরের সম্বন্ধ হয়, তখন ভালবাসা আসিতে পারে না। তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধকে প্রেমের উপর স্থাপিত কর। তখন দেখিবে, কেহ কারো মই নহে অথচ সকলের সাহায্যে সকলেই উপরে উঠিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের অঞ্চলে এই কয়দিনে যেখানে যে কয়খানা পত্র দিয়াছি, সবগুলি পড়িও। দুই বৎসর আগে ভাবের বন্যা আসিয়াছিল; পলি পড়িয়াছিল। পলিমাটিতে যে ভাবে চাষ করিতে হয়, তাহা তোমরা করিতে পার নাই। তারপরে আসিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। যুদ্ধের শেষ দিক দিয়া তোমরা অনুভব করিলে যে, এত পলি জমিয়াছিল যে তোমরা ইচ্ছা করিলেই এক অভাবনীয় সাফল্য অৰ্জ্জ ন করিতে পারিতে। তোমরা আমার-জমি তোমার-জমি বিচার করিয়াছ। কিন্তু তোমার-আমার প্রত্যেকের জমি যে সর্ব্বসাধারণের জমি, একথা বুঝিতে চেষ্টা কর নাই। ফলে, যাহাকে নিজের লোক বলিয়া ভাবিয়াছ, কেবল তাহারই সহিত যোগাযোগ করিয়াছ। কিন্তু জগতের সকল আপন এবং পর নির্ব্বিচারে যে তোমাদের আপন, এই কথা ভাবিবার এখন সময় হইয়াছে। যে কার্য্যটিতে করিয়াছ তোমরা অবহেলা, আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই কার্য্যটিতে হাত দাও।

সর্ব্বপ্রথমে প্রতিজনে আদর্শে হও পূর্ণ বিশ্বাসী। তারপর ঘরে বাহিরে সকল স্থানে তাহা প্রচারের কর ব্যাপক অভিযান। একটা নির্দ্দিষ্ট মতাবলম্বী মুষ্টিমেয় কয়জনে জগৎ উদ্ধার করিবে, ইহা তোমাদের বিষম ভ্রান্তি। সমগ্র জগৎকে সঙ্গে লইয়াই সমগ্র জগতের

সেবা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচারকেরা নিজেদের মত সর্ব্বত্র অবাধে প্রচার করিতেছেন বলিয়াই তোমাদের আদর্শ হইয়া গেল প্রচারের অযোগ্য, ইহা কোনও যুক্তিযুক্ত কথা নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও অশিস জানিও। তোমার ৯ই বৈশাখের পত্রখানা পাইলাম। নানা মঠের মহাপুরুষেরা জীব উদ্ধারের কামনায় স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছেন এবং বহু মুমুক্ষু নরনারীকে ধর্ম্ম ও সাধনার পথ দেখাইতেছেন, ইহার ফলে তাঁহাদের ধর্ম্মসংঘের বিপুল সংখ্যাপরিপুষ্টি ঘটিতেছে—ইহাতে তোমাদের বিরক্ত হইবার কিছুই নাই। ধর্ম্মদান করিয়া যাঁহারা পরমেশ্বরের সহিত মানুষের সম্পর্ক নিকটতর করিতেছেন, আমি মনে করি, তাঁহাদের কার্য্যের ফলে এক মানুষের সহিত অপর মানুষের সম্বন্ধও নিকটতর হইতেছে। ইহাই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যদি ইহার ব্যত্যয় ঘটে, তবে দুশ্চিন্তার কথা বটে কিন্তু সে ভাবনা তোমরা না ভাবিয়া ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দাও। যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, সবই ভগবানের নামের উপর। সুতরাং তোমরা সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিস্তৃতির মধ্যেই শ্রীভগবানের

মহিমা-বিস্তারকে লক্ষ্য করিও। ভগবানকে যে ডাকে, সে-ই আমাদের প্রিয়। ভগবানকে যিনি ডাকিতে বলেন, তিনিও আমাদের প্রিয়। ব্রহ্মাণ্ডের সকলে আমাদেরই মতাবলম্বী হইয়া ভগবানকে ডাকুক, নতুবা তাহারা অধঃপাতে যাউক, ইহা আমাদের মনোভঙ্গী নহে। পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মাচার্য্যই যাহাদিগকে নিজের মতে টানিতে পারিলেন না, সেই হতভাগ্যেরাই আমাদের সেবার লক্ষ্যস্থল হউক। সকলে সকল মত প্রচার করিয়া যাইবার পরেও যে কয়টা দুর্ভাগা কাহারও মতই গ্রহণ করিল না, তাহাদিগকেই আমরা আমাদের মতে বা পথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিব। যাহারা পথ পাইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিজ পথে গমনের দ্বারা পরম আত্মোন্নতি লাভ করুক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করিব। পন্থাহীন পথ পাইয়াছে। এ পথ সে যাহার নিকটেই পাইয়া থাকুক, আমাদের তাহাতেই অপার আনন্দ। নিজেদের দল বাড়াইয়া অন্য কাহারও দলকে আমাদের তুলনায় ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ দেখিবার হীন কামনা আমাদের কেন হইবে?

নাম শুনিয়া তুমি সাধু দেখিতে গিয়াছিলে। তাঁহাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও পূজা দিয়া আসিয়াছ, ইহা খুবই সুখের কথা। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যেই সম্প্রদায়েরই হউন, আমাদের সকলেরই সমভাবে সম্মাননীয়। ভগবানের ভক্তকে পূজা করিলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। কে কাহার অপেক্ষা বড়, আর কে কাহার অপেক্ষা ছোট, সেই সকল বিচারে নামিবার তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। মহাপুরুষ মহাপুরুষই। তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তি হইলে, তাঁহার কতক সদ্‌গুণ

তোমাতে আপনা আপনি আসিয়া যাইবে। ইহা তোমার পক্ষে এক পরম লাভ। অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া যে লাভটুকু অর্জ্জন করা যায়, তাহাতে হেলা করা ত' মূর্খতা। তোমরা সকলেরই পূজা-পাঠ-উৎসবাদিতে সানন্দে যোগদান করিতে পার। কেবল একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিজের ভাবের ঘরে না ফাঁকি আসে। ঈর্ষা, অসূয়া, দ্বেষ প্রভৃতি তোমাদের কাছ হইতে শত যোজন দূরে থাকিবে। নিজ ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া যেখান দিয়া যতটুকু পার সকল মত ও পথের যাজকদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভক্তি করিবে।

একটা কথা মনে রাখিও। অপরে কি করিয়াছে বা না করিয়াছে, সেই সকলের চুলচেরা সমালোচনায় প্রবেশ না করিয়া তোমাদিগকে ধর্ম্মধ্বজিতা ও ধর্ম্মব্যবসায় এই দুইটী বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্ম করি না অথচ ধার্ম্মিকের আখ্যা চাই, ইহা সর্ব্বনাশকর। আর ধর্ম্ম-প্রচারকে ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি বা লৌকিক যশঃ-প্রতিপত্তি বর্দ্ধনের চেষ্টা মহামারীর ন্যায় জাতিধ্বংসকর। এই উভয় অনিষ্ট হইতে তোমরা নিজেদিগকে মুক্ত রাখিও। কিন্তু তোমাদের যাহা ভাব ও আদর্শ, তাহা জন-সমাজে প্রচার করিতে কখনও ক্ষান্ত রহিও না।

ভিন্ন ভাব ও আদর্শের রসে যাহাদের জীবন সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই ফলে যাহারা ভগবৎ-প্রেমে মজিয়াছে, তাহাদিগের ভাবভঙ্গকর কোন কার্য্যও কখনও করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও অশিস নিও। তোমার পত্রে তোমার অসুখের বিবরণ জানিয়া চিন্তিত হইলাম। অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ভগবানে নির্ভর করিয়া চিকিৎসা চালাইয়া যাও। ঔষধের মধ্যেও ভগবানই আছেন। ঔষধের ভিতরে ভগবানের উপস্থিতি চিন্তা করিয়া ঔষধ সেবন করিবে।

তোমার অসুখ করিয়াছে বলিয়া যেন তোমাদের সকলের সামুহিক কর্ত্তব্যগুলি পড়িয়া না থাকে। যত করণীয় কাজ, সবই একা তোমাকেই করিতে হইবে, তুমি দুদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিলে অন্যেরা সেই কাজগুলিতে হাত ছোঁয়াইবে না, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। নির্দ্দিষ্ট একটা লোক না থাকিলে অন্যেরা কাজ করিবে না, ইহা সুনিশ্চিত এক দুর্ল্লক্ষণ। সঙ্ঘ-শরীরে এই দুর্ল্লক্ষণ কোনও প্রকারে না আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, এই বিষয়ে কি তোমাদের সচেতন হওয়া উচিত নয়?

সকলকে অবিলম্বে ডাক। বল, নিজ নিজ ঘর-সংসারের কাজ কিছু কিছু কমাইয়া হইলেও সকল বিশ্বাসীরা জন-কল্যাণকর কাজে হাত লাগাউক। বৃথা প্রজল্পে কত সময় নষ্ট হয়। সেই সময়টুকু বাঁচাইয়া জগতের কাজে নিয়োগ করুক। সময় পাই না বলিয়া আর যেন কেহ কর্ত্তব্য এড়াইয়া না চলে। আমার নিকটে যাহারা দীক্ষিত

হইয়াছে, তাহারা থাকিবে বিশ্ববাসীকে ভুলিয়া? তোমাদের দীক্ষাপ্রাপ্ত নামে জগৎকল্যাণের যে মহাবীজ লুকাইয়া আছে, তাহাকে তোমরা অঙ্কুরিত হইতে দিবে না?

দূরে যাহারা অবস্থান করিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা নিকটতরদের প্রতি সেবা অর্পণ সহজতর। কে তোমাদের বলিয়াছে আপাততঃ জংপুই বা মাইবং যাইতে? এতদিন যেখানে যাইতে পারিলে না, আজ হঠাৎ গুরুতর বিপদের মুখে সেখানে যাইতে হইবে না। তোমরা ঘরের অজ্ঞ মানুষগুলির ভিতরে ধর্ম্মের অভিযান নিয়া চল। তোমাদের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। প্রেম নিয়া যেখানে যাইবে, সেখানেই কাজ সুনিশ্চিত। ঘরেও কত কাজ করিবার আছে।

একা তোমারই অসুখ। সকলের অসুখ হয় নাই। সকলে কাজে লাগুক। তুমি বুদ্ধি এবং প্রেরণা দিয়া সকলকে কাজে লাগাও। প্রেমময় বন্ধুর মত তাহাদিগকে হিতবুদ্ধি দাও, রুদ্র শাসক রূপে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমাকে তোমরা তোমাদের মধ্যে সশরীরে

পাইতে চাহ। কিন্তু আমি যে আমার বাণীর মধ্য দিয়া তোমাদের কাছে আছি, তাহা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া কি উপলব্ধি কর না? তোমরা সমবেত উপাসনায় বসিয়া কি তোমাদের সাথে আমাকে পাওনা? তোমরা হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে যাইয়া কি তোমাদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাও না? একটু প্রেম ও একটু অভিনিবেশ থাকিলে ঐ সময়ে তোমাদের মধ্যে আমাকে পাওয়া কি অসাধ্য?

শরীর এখন ভ্রমণের যোগ্য নহে। যোগ্য হইবামাত্র ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করিয়া বাহির হইয়া পড়িব। যথাকালে সেই ভ্রমণ-তালিকা তোমরা পাইবে কিন্তু আমাকে সশরীরে পাইবার চেয়ে অনেক বড় কাজ তোমাদের রহিয়াছে। যাহাদের আমি চাহি, তাহাদের সকলকে সশরীরে সর্ব্বান্তঃকরণে আগে তোমাদের মধ্যে পাইতে হইবে। ঐ যে অজ্ঞ, মূর্খ, সভ্যতা-বঞ্চিতের দল, যাহারা মনুষ্যজন্ম গ্রহণের তাৎপর্য্য পর্য্যন্ত জানিল না বুঝিল না, তাহাদের যে দলে দলে চাই। তোমরা কি তাহাদের মধ্যে তোমাদের করণীয় কাজগুলি করিতেছ?

আমি তোমাদের মধ্যে আসিব, এই পরিতৃপ্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলেই চলিবে না বাবা, আমার আসার কালে শতে শতে হাজারে হাজারে সভ্যতার গণ্ডী-বহির্ভূত আদিম নরনারীদের একত্র করিতে হইবে। তাহাদের আমি প্রেমালিঙ্গন দানে জয় করিয়া চিরতরে আপন করিয়া লইতে চাহি। ধনী, মানী, যশস্বী, ব্যক্তিদের উদ্ধার করিবাব জন্য যোগ্য গুরুর অভাব নাই কিন্তু এই সকল চির-অনাদৃতকে ভালবাসিয়া বুকে তুলিয়া লইবে কে? ইহারা সংখ্যায় কম নহে,

ইহাদের সম্ভাবনীয়তাও সামান্য নহে কিন্তু কেহই ত' ইহাদের পানে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিতে চাহিল না। যখন ইহারা সভ্য হইবে, ধনী হইবে, সম্মানী ও যশস্বী হইবে, তখন আমরা ইহাদের কাছে আসিলে কি লাভ হইবে? পতিতকেই তুলিতে হয়, উত্থিতকে তুলিবার আয়োজনে সার্থকতা কি?

অদূরে রণোন্মত্ত নাগারা নিজেদের অন্তরের অশান্তি চতুর্দ্দিকের শান্তিপ্রিয় নরনারীদের উপরে বিভীষিকা রূপে চাপাইয়া দিতেছে। আশ্বাস, বিশ্বাস, আস্থা, নির্ভর সব-কিছু মানুষের মন হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছে, এই সময়েই ত' সকলের মনে প্রেমের প্রলেপ লাগাইয়া দিবার সত্যসঙ্কল্প নিয়া আমাদের যাওয়া উচিত।

একজন শিক্ষিত পাহাড়ী নেতা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছ, তাহা আমি গভীর তৃপ্তির সহিত অনুধাবন করিলাম। কিন্তু আমি কবে আসিব, এইটুকু ঔৎসুক্যই ত' যথেষ্ট নহে বাবা। আমি যেদিনই অসিবার অবসর করিতে পারি, তার আগে প্রতিটি দিন যে তোমাদের করণীয় কত কাজ রহিয়াছে। যে কয়টী মাথাওয়ালা কর্ম্মী তোমরা ওখানে আছ, সকলে মিলিয়া দ্রুত স্থির কর যে, তোমাদের অনলস কর্ম্মপ্রবাহ নদী-ধারার মত অবিশ্রাম প্রবহমান রাখিবার জন্য কি পন্থা তোমরা ধরিবে। কেবল জল্পনা-কল্পনায় কিন্তু হইবে না। কাজের মত কাজ করা চাই। আমার সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, এমন যে যেখানে আছে, তাহাদের সকলকে ডাকিয়া আনিয়া এই দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দাও যে, কেবল নিজের ক্ষুদ্র সংসার ও তাহার কর্ত্তব্যটুকুর

প্রতি অবহিত থাকিলেই চলিবে না। বাহিরেও দৃষ্টি দিতে হইবে, বাহিরেও ছুটিয়া যাইতে হইবে। আমি তোমাদের প্রত্যেককে যুদ্ধের ঘোড়ার মত বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন, কর্ম্মঠ ও নির্ভীক দেখিতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও অশিস নিও। তোমার তিনখানা পত্র পাইলাম। বুঝিলাম, তুমি আতঙ্কিত হইয়াছ। ভারত-সরকার পরিবার-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যেরূপ কৃত্রিম পন্থার আশ্রয় নিতেছেন, তাহা ভারতীয় শুচিতার ধারণার সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন নহে বলিয়া তোমার ন্যায় আরও শত শত ব্যক্তি এইভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া কত কত কর্ম্মীকে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে লাগাইয়া দিয়াছেন। অনেক ডিগ্রীধারী প্রবীন লোকও এই কাজে আগ্রহ নিয়া লাগিয়াছেন। দুদিন সবুর করিয়া তাঁহাদের কেরামৎটা একবার দেখিয়া লও, তারপরে আতঙ্কিত হইও। সহজ সরল স্বাভাবিক পথ পরিহার করিয়া যখনই কোনও আন্দোলন কৃত্রিম ব্যবস্থার উপরে নিজ বনিয়াদ গাড়ে, তখন তাহা সাধারণ মানুষগুলিকে প্রভাবিত করিতে অক্ষম

হয়। ফলে আমার মনে হয়, তখন দেখা যাইবে যে, কিছু কিছু উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ছাড়া অন্যেরা কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ের পরেও এই পথে পা বাড়াইতে আসিল না। রাষ্ট্রের এই সুবিপুল পরিমাণ অর্থ অন্য হিতকর কাজে ব্যয়িত হইলে ভাল হইত বলিয়া তখন লোকে বর্ত্তমান উদ্যোক্তাদিগকে হয়ত ধিক্কার দিবে।

সুতরাং তোমরা এই সকল বিষয় সম্পর্কে সকল দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়া নিজেদের আরব্ধ সমাজসেবার কাজগুলিতে ভাল করিয়া মন দাও। প্রেমকেই জীবনে প্রধান করিয়া অন্য সকল ব্যাপারকে তাহার অধীন কর।

দাম্পত্যজীবনেও প্রেমের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই তোমাদের অনেকের পক্ষে অতিরিক্ত যৌন ব্যবহারের প্রয়োজন পড়িতেছে। প্রত্যেকটী স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অকপট প্রেমবর্দ্ধনে সচেষ্ট হউক, প্রেম আসিলে কাম কমিয়া যায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, অসুখ হইয়াছে বলিয়া এত বিহবল হইয়াছ কেন? ভগবানের নামে নির্ভর কর। জীবন-তরণীর ভার তাঁহার উপর

অর্পণ কর। ভবিষ্যতের যাবতীয় শুভাশুভ তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও। একান্ত ভাবে তাঁহারই হাতের যন্ত্রটুকু হইয়া তুমি রোগশয্যায় পড়িয়াও সকল যন্ত্রণার মধ্যে তাঁরই সুকোমল কর-স্পর্শ পুলকিত চিত্তে অনুভব করিতে থাক। অসুখ উপলক্ষে বাহিরের কাজ-কারবার ত' অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার জীবনের সকল কাজ-কারবার ও মূলধন তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিজে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। তাঁর লাভক্ষতি তিনিই দেখুন।

আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

তুমি যেই সহরে আছ, সেখানে আমার পরিচিত ব্যক্তি খুব অল্পই আছেন। তথাপি নিয়ত অনুভব করিতেছি যে, সেখানেও আমার শত শত আপনার জন আমার প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছেন। সময় সুযোগ হইলে আমি সেখানে যাইব এবং তাঁহাদিগকে বুকে ধরিয়া তৃপ্ত হইব।

আপনার জনদের সম্পর্কে আমার একটা ধারণা একেবারে বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে, কারণ তাহা আমার উপলব্ধ সত্য। যে আমার আপন, সে অনন্তকাল আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং এই জন্যই সে দীন, হীন, অন্ত্যজ হইলেও আমার নিকটে পরম আদরের সামগ্রী। অযোধ্যার রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের নিশ্চিতই অনেক রাজকীয় বন্ধু ছিলেন। কিন্তু গুহক বা শবরীর চেয়ে আপন তাঁহার আর বোধ হয় কেহ ছিল না। ইহারা প্রতীক্ষার বলে আপন হইতেও আপনতর হইয়াছিল, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না।

তুমি তোমার জীবনকে সাধনময়, ভজনময়, আত্মসমর্পণময় কর। তোমার জীবনের যে সৌরভ তোমার উপাসনা-গৃহ হইতে ছুটিবে, তাহা আর কেহ টের না পাইলেও আমার আপনার-জনদিগকে তোমার সন্নিহিত করিয়া দিবার পক্ষে হইবে প্রধানতম প্রেরণা। বাহিরের দিকে দৃষ্টি না দিয়া তুমি তোমার সাধনার দিকে অধিক দৃষ্টি দাও। তুমি যখন পূরাপূরি আমার আপন হইয়া যাইবে, তখন আমার আপনার জনেরা অজ্ঞাতবাস হইতে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিবে। চাল নাই, কৌশল নাই, ফন্দী নাই, ফিকির নাই, অথচ স্বভাবের বশে সবাই আসিয়া বুকের কাছে দাঁড়াইবে। টানাটানি নাই, ডাকাডাকি নাই, চোখের ইঙ্গিত নাই, হাতের ইশারা নাই, তবু তাহারা আসিবে, ভালবাসিবে এবং নিজেদের সঙ্গ দিয়া সকলের মনের জ্বালা নাশিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্থানিক দূরত্ব দূরত্বই নহে, মানসিক দূরত্বই প্রকৃত দূরত্ব। যত অধিক-সংখ্যক মানুষের সহিত মানসিক নৈকট্য স্থাপন করিতে পারিবে, মানুষ হিসাবে তুমি তত বড় হইবে। ধন, বিদ্যা, যশ বা প্রতিপত্তি কাহাকেও বড় করে না। বড় করে মন। যার মন যত বড়, সে তত বড়। আমি চাহি, আমার প্রত্যেকটী পুত্রকন্যা সত্যিকারের মানুষ হউক এবং ক্ষুদ্র তুচ্ছ সাধারণ মানুষ না থাকিয়া প্রকৃত বড় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। যত বড় বিপদেই পড়িয়া থাক না কেন, তোমারও উদ্ধার আছে। ক্ষণকালের জন্যও নিজ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা হারাইও না।

আমি তোমার উপায় করিয়া দিতে পারিব বলিয়া ভাবিয়াছ। বেশ ত', আমি তাহা করিব। কিন্তু আমি ছাড়া জগতে আর কোনও উদ্ধারকর্ত্তা নাই, এমন কথা ভাবিও না। জগতে কত স্থানে কত মহাপুরুষ যে কত ভাবে কত জীবকে কত নীচ হইতে উপরে টানিয়া তুলিয়া অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তাহার খবর কে রাখিতে পারে? জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ভগবান মানুষের রূপ ধরিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে, কেহ পারে না। যে ঠিক ঠিক চিনিতে পারে, সে সহজে উদ্ধার পাইয়া যায়।

তবে একটা কথা জানিও। জীব উদ্ধার পায় তার নিজের বলে। ভগবানই তাহার আত্মায় বিরাজ করিয়া তার মনের মধ্যে বল রূপে এবং বাহুর মধ্যে পুরুষকার রূপে আত্মবিকাশ করেন। ভগবানের দয়া এই ভাবে জীবের ভিতরে প্রকাশ পায়। নিজেকে একেবারে অপদার্থ মনে করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিও না। তোমাতে আর ভগবানে ভেদ নাই। তিনিই তুমি, তুমিই তিনি। অন্তরে প্রেমের উদয় হইলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। প্রেম প্রগাঢ়তম হইলে ইহা পূর্ণ উপলব্ধিতে আসে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সেই সুদিন হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * চমৎকার কথা লিখিয়াছ। মহাপুরুষটী যাকে তাকে দীক্ষা দেন না। তবে কি লোক বাছিয়া দীক্ষা দেন? কেমন লোককে দেন? গরীবকে? মূর্খকে? নীচ, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যকে? তাই যদি দেন, তবে ত' তিনি আমার মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, দিন-রজনী পূজা পাইবার যোগ্য সোণার মানুষ। নাকি, ধনীকেই দেন, বিদ্বানকেই দেন, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ সম্মানী দামী ব্যক্তিদেরই দেন? কিন্তু এসব মূল্যবান্ মনুষ্যদের সাথে ডোম, মুচি, মেথর এক পংক্তিতে বসিয়া দীক্ষা নিতে পারে কি? এই অভাগারা ত' বঞ্চিত হয় না? অথবা এইসব মূল্যহীন মনুষ্যগুলির প্রতি কৃপা হইলেও মূল্যবান সম্মানী মানুষদের কাছ হইতে দূরে নিয়া তাহাদের দীক্ষা দেওয়া হয়? গুরুদেবের উৎসবে একদল অভ্যাগতকে ঘরে বসাইয়া মালপোয়া পরিবেশন করিয়া আর একদলকে বাহিরের উঠানে বসাইয়া খিচুড়ী বিতরণের মত দীক্ষাকালেও কি দীক্ষার্থীর জাতি-বিচার, ধন-বিচার, প্রতিষ্ঠা-বিচার করা হয়? তোমার পত্র হইতে তাহার হদিস মিলিল না মা।

কেহ দীক্ষা নিয়াছে শুনিলেই আমি ভারী খুশি হইয়া যাই। দীক্ষা কার কাছ হইতে নিল, তাহা ভাবিবার আমার অবসর হয় না। তার

আগেই আনন্দে প্রাণ নাচিয়া ওঠে। আহলাদ করিতে থাকি, একজন ভগবানের পথে পা বাড়াইল, একজন জীবনের অতীত গ্রন্থি ছিন্ন করিবার ব্রত লইল, আমার প্রাণ-প্রিয়তমের দিকে একজন ধাবিত হইল। শত শত লোক দীক্ষা নিতেছে শুনিলে আমি আরও খুশী, আরও অধিক আমার আনন্দ। যার কাছে ইচ্ছা নেউক, কিন্তু দীক্ষাই ত' নিয়াছে, ভগবানকে ইহজীবনেই দর্শন করিবার সঙ্কল্পই ত' গ্রহণ করিয়াছে! এ লাভ যে আমাদের সকলের।

লোকগুরুগণের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনে তোমরা ক্লিষ্ট হইও না। আনন্দ করিও। পৃথিবীর প্রত্যেকটী ধর্ম্মসঙ্ঘের শ্রীবৃদ্ধিতে তোমরা আনন্দিত হইও। এমন ক্ষীণমনাঃ হীনবুদ্ধি তোমরা হইও না যে, তোমাদের মতে দীক্ষিতদের সংখ্যা না বাড়িয়া অন্যদের মতে কেন বাড়িতেছে। দীক্ষাদান-কালে আমি তোমাদের প্রতি জনকে বলিয়া দিয়াছি,— সমদীক্ষিতের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য কোনও চেষ্টা তোমরা করিও না, কারণ তোমাদের যাহারা আপন, তাহারা আপনা আপনিই তোমাদের সমীপস্থ হইবে। বলিয়াছি,—তোমরা নিজেরা সাধন করিয়া বলীয়ান্ হও, বলই তোমাদের প্রয়োজন, দল নহে। যাহারা গুরুর কাছ হইতে এমন উপদেশ পায়, যাহারা গুরুর জীবনের আচরণে এই জিনিষই দেখিতে পায় প্রতিফলিত, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের গোষ্ঠীপুষ্টিতে অন্তরে আপত্তি অনুভব করিবে কেন? তোমরা এই সকল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে নিজেদের স্থাপন কর। আমি বিশ্বের সকলের সহিত তোমাদের মিলাইতে চাহিতেছি। বিশ্বের একজনকেও তোমাদের পর

ভাবিলে চলিবে না। অন্যত্র দীক্ষা নিয়াছে বলিয়াই যদি কেহ তোমাদের পর হইয়া থাকে, তবে জানিতে হইবে, আমার নিকটে দীক্ষালাভ তোমাদের সত্য সত্য হয় নাই। সকলের প্রতি ঈর্য্যাহীন প্রেমভাব পোষণ করিয়া তোমরা নিজ নিজ দীক্ষার সম্মান রক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা আশীস নিও।

অদ্যকার সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিলাম, তাহাতে বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত হইলাম। বিদ্রোহী নাগারা তোমাদের বাজার ও ষ্টেশন লুণ্ঠন করিয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে প্রকাশ। এইরূপ অবস্থায় যাহা যাহা আশঙ্কা করা যায়, আশা করি, তদ্রূপ গুরুতর কোনও অনিষ্ট তোমাদের কাহারও হয় নাই। স্বল্পমাত্র আনিষ্ট হইয়া থাকিলেও তাহা দুঃখের সন্দেহ নাই। তবে আশা করি, তোমরা এই আকস্মিক বিপৎপাতে কেহই মুহ্যমান হও নাই।

এইরকম উৎপাত ঐ অঞ্চলে হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলে। কোনও কোনও খণ্ডজাতির লোকদের ভিতরের

উষ্মা কখনও কখনও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের চোখে ধরা পড়িয়াছিল বলিয়াও শুনিয়াছি। এ সকল সত্ত্বেও তোমরা চারিদিকের নানা কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া খণ্ডজাতি-গুলির মধ্যে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ ও জীবনযাপনের নীতিবাদ কুণ্ঠাহীন দ্বিধাবর্জ্জিত মনে প্রচার করিয়া আসিতেছিলে। সাধারণ দৃষ্টিতেই তোমাদের সে কাজে যথেষ্ঠ দুঃসাহসিকতা ছিল। সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, গুরুবাক্য পালনে তোমরা যে অসমসাহসিকতার ধারাবাহিক পরিচয় দিয়া আসিতেছিলে, তাহা অতুলন ও অনুপম।

এই অনুপম ও অতুলন দৃষ্টান্ত তোমাদের কর্ম্মে ইহার পরেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। বিদ্রোহী নাগাদের এই অনুপ্রবেশ প্রতিবেশী খণ্ডজাতিগুলির কতকাংশের সম্মতি বা সহযোগের ভিতর দিয়া হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। সুতরাং আগে তোমাদের পক্ষে পতিতোন্নয়ন কার্য্য যেমন কঠিন ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা শতগুণ কঠিন হইল। তথাপি তোমাদের পক্ষে কর্ম্মতালিকা পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। সাময়িক অবস্থার বিবেচনায় কর্ম্মধারার আবশ্যকীয় সংশোধন অবশ্যই করিতে হইবে এবং আগে যে কাজ প্রশংসনীয় গতিতে চলিয়াছিল, এখন তাহার বেগ কিছু কমাইতে হইবে।

তোমাদের বিস্তারিত পত্র পাইবার পরে এই বিষয়ে আবশ্যকীয় নির্দ্দেশ দিব। তবে এই প্রসঙ্গে এই কথাটি আমি তোমাদের ভালো

করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, যাহারা তোমাদের কাহারও কাহারও হয় ত' সর্ব্বস্বই লুণ্ঠন করিয়াছে এবং অসহনীয় দুর্ব্ব্যবহারও করিয়া থাকিবে, তাহারা আততায়ী হইলেও তোমাদের পর নহে। আজ যাহারা শত্রুবৎ তোমাদের উপরে আপতিত হইয়াছে, কাল তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্বের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া হৃদয়ের হৃদয় স্বরূপ করিয়া লইবার মহনীয় ব্রতই তোমাদের জীবনসাধনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)